Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা হোসেন মীম

রোলঃ 227021352

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা হোসেন মীম

রোলঃ 227021352

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানজিদা হোসেন মীম, আইডিঃ 227021352 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sunzida

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সানজিদা হোসেন মীম

আইডিঃ 227021352

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

হযরত আদম আ:

মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম কে মাটি দ্বারা মানবাকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কুরআনে বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

"আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে। (সূরা হিজর- আয়াত ২৬)

অতঃপর তাঁর পাঁজর থেকে হযরত হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করেছেন । আর এ কারণেই স্ত্রী জাতি স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ জাতির অনুগামী ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম আ. কে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

✍ হযরত আদম আ. এর সৃষ্টি...

আল্লাহ্ তাআলা যখন দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির কথা ফেরেশতাদের জানালেন এবং বললেন বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। ফেরেশতাগণ এর এই প্রশ্ন আপত্তি জানানোর উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তারা এ কারণে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে, যে মাখললুক অন্যের সাথে পাপ করারও যোগ্যতা সম্পন্ন হবে যার পরিণামে পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে সৃষ্টি করার রহস্য কি ? আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না (সূরা বাকারা ২/৩০)। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহর বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল হুকুম তামিলকারী জাতি নয়।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন।এখানে সমস্ত নাম দ্বারা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় বস্তুর নাম, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং মানুষ যে ক্ষুধা, পিপাসা, সুস্থতা অসুস্থতা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হয় তার জ্ঞান বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্টবস্তুর ইল্ম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল।

তারপর তিনি আদম আলাইহিস সালামকে ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাকে এসব জিনিসের নাম জানাও। (সূরা বাকারা ২:৩১) তো সঙ্গত কারণেই তারা উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এভাবে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা কার্যত স্বীকার করিয়ে নিলেন যে, এই নতুন সৃষ্টির দ্বারা তিনি যে কাজ নিতে চান, তা তাঁরা আঞ্জাম দিতে সক্ষম নন । তাঁরা বললেন,

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (সূরা বাকারা আয়াত ৩২)

আল্লাহ বললেন, হে আদম তুমি তাদেরকে এসব জিনিসের নাম বলে দাও। সুতরাং যখন তিনি তাদেরকে সে সবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি আমি আকাশমণ্ডলে পৃথিবীর রহস্য জানি এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো এবং যা কিছু গোপন করো সেসব সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে? (সূরা বাকারা ২/৩৩) আদম আ. কে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে আদম আ. এর প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো (সূরা সাদ - আয়াত ৭২)

কুরআনের বর্ণনা সমূহ থেকে একথা স্পষ্ট যে, আদম আ: সিজদা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল।

আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদা মাত্র।

আল্লাহ্ তাআলা যখন আদম আ. কে ফেরেশতাদের সিজদা করার নির্দেশ দিলেন তখন তারা সকলে তাঁকে সিজদা করলেন একমাত্র ইবলিস ছাড়া । সে অহংকারবশত অস্বীকার করলো। অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিলো তুমি কি অহংকার করলে নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিছু? (সূরা সাদ ৩৮/৭৫) সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা। আল্লাহ্ বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। কেননা তোর এই অধিকার নেই যে এখানে থেকে অহংকার করবি সুতরাং বের হয়ে যা। তুই হীনদের

অন্তর্ভুক্ত (সূরা আরাফ ৭/১২-১৩) তারপর ইবলিস আল্লাহ্ তাআলার কাছে আবেদন করল যেদিন হাশর হবে এবং মানুষকে কবর থেকে জীবিত করে উঠানো হবে সেই দিন পর্যন্ত যেন তাকে অবকাশ দেওয়া হয় । কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাকে সে প্রতিশ্রুতি দেননি বরং বলে দিয়েছেন তোকে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হল ।

নির্দিষ্ট সে সময় হলো শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত। তখন ইবলিস মানুষকে পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী করার শপথ করল । সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত' (হিজর ১৫/৩৪-৪০; সাদ- ৩৮/৭৯-৮৩)। উল্লেখ্য যে, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হ'লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন। (২) আর এটা ছিল মানুষের পরীক্ষার জন্য। শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম হবে।

✍ হযরত হাওয়া আ. এর সৃষ্টি...

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, হাওয়া আ. মানব জাতির প্রথম নারী এবং আদম আ. এর স্ত্রী। হাওয়া আ. এর সৃষ্টি আদম আ. এর জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হয়েছিল ।

সিজদা অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ আদম আ. এর জুড়ি হিসাবে তার অবয়ব হ'তে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হ'তে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন ।(১) কুরআনে সরাসরি হাওয়া (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা না হলেও তাঁর সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ কুরআনে বলেন: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।"(সূরা নিসা - আয়াত ১) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "নারীদের প্রতি সদাচরণ করতে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, কারণ নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বাঁকা অংশ তার উপরিভাগ। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তবে তা বাঁকা থেকেই যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি সদাচরণ করো।"(৩)

✍ আদম আ.ও হাওয়া আ. এর জান্নাতে অবস্থানকাল...

হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা হয় খাও, তবে এই (বিশেষ) গাছটির কাছেও যেওনা। গেলে তোমরা দুজন সীমালংঘনকারী -দের অন্তর্ভুক্ত হবে।অতঃপর শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা

দিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল তাদের পরস্পরের সামনে প্রকাশ করতে পারে। সে বলতে লাগলো, তোমাদের প্রতিপালক অন্য কোন কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই এই গাছ থেকে তোমাদেরকে বারণ করেছিলেন পাছে তোমরা ফেরেস্তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ কর।(সূরা আরাফ - ১৯-২০) সূরা ত্বহার ১২০ নং আয়াতেও এ বিষয়ে বলা হয়েছে, শয়তান আদম আ. কে বলল, হে আদম তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্ধান দেবো যা দ্বারা অনন্ত জীবন ও এমন রাজত্ব লাভ হয় যা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না?অর্থাৎ তুমি এখন যে সুখ সম্ভব ও শান্তিতে আছো, চিরজীবন তা ভোগ করতে পারবে। তুমি লাভ করবে এমন রাজত্ব, যার কখনো বিনাশ ঘটবে না। ইবলিসের এ বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক এবং

অবাস্তব। সে তাঁদের প্ররোচনা দিয়ে সেই গাছের ফল খেতে প্রস্তুত করে ফেলল। তারপর যখন তাঁরা সেই গাছের ফল খেয়ে ফেললেন, তখন তাঁদের শরীর থেকে

জান্নাতি পোশাক খুলে গেল। ফলে তাদের লজ্জাস্থান সমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। তখন তাঁরা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগলেন।তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদের এই বৃদ্ধির নিকটবর্তী হতে নিষেধ করিনি?এবং তোমাদের বলিনি

শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? আল্লাহ তাআলা (আদম আ.তাঁর স্ত্রী ও ইবলিসকে) বললেন, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আছে একটা কাল পর্যন্ত অবস্থান ও কিঞ্চিত ভোগ। আদম যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না আল্লাহ তায়ালার কাছে কি শব্দের ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা তো অন্তর্যামী এবং তিনি পরম দয়ালু ও দাতা ও বটে। তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামের মনের এই অবস্থার কারণে নিজেই তাকে তাওবার ভাষা শিখিয়ে দিলেন যা সূরা আরাফের ২৩নং আয়াতে বর্ণিত আছে তা এরূপ-

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين

তাঁরা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক আমরা নিজসত্তার উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁদের তাওবা কবুল করলেন এবং তাঁদের পথ নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যদি কোন হেদায়েত পৌঁছে তবে যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত ও হবে না।(সূরা বাকারা-৩৮, সূরা ত্বহা- ১২৩)

উল্লেখ্য যে, নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ এবং হযরত আদম আ. ও ছিলেন নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করেননি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে তিনি

সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا- 'অতঃপর আদম ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি'(সূরা ত্বহা -১১৫)। তাছাড়া উক্ত ঘটনার সময় তিনি নবী হননি,বরং পদস্খলনের ঘটনার পরে আল্লাহ তাকে নবী মনোনীত করে দুনিয়ায় পাঠান ও হেদায়াত প্রদান করেন' (সূরা আ'রাফ -১২২)।

আদম আ. এর পৃথিবীতে আগমন...

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে ছহীহ সনদে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও হাকেম রহ. বর্ণনা করেন যে, ألست بربكم 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? বনু আদমের কাছ থেকে এই বহুল প্রসিদ্ধ 'আহদে আলাস্ত্ত' বা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিটি তখনই নেওয়া হয়, যখন আদম আ.-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া
হয়। আর এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল না'মান (وادى نَعْمَان) নামক উপত্যকায়, যা পরবর্তীকালে 'আরাফাত'-এর ময়দান নামে পরিচিত হয়েছে।(৪) এর দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র এবং তা সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল এখনও আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ পৃথিবী ও সৌরলোকের বাইরে দূরে বহুদূরে অগণিত সৌরলোকের সন্ধান দিয়ে কুরআন ও হাদীছের তথ্যকেই সপ্রমাণ করে দিচ্ছে।
আদম ও হাওয়া আ. কে জান্নাত থেকে নামিয়ে দুনিয়ায় কোথায় রাখা হয়েছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে আদমকে সরনদীপে (শ্রীলংকা) ও হাওয়াকে জেদ্দায় (সঊদী আরব) এবং ইবলীসকে বছরায় (ইরাক) ও ইবলিসের জান্নাতে ঢোকার কথিত বাহন সাপকে ইস্ফাহানে (ইরান) নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ বলেছেন, আদমকে মক্কার ছাফা পাহাড়ে এবং হাওয়াকে মারওয়া পাহাড়ে নামানো হয়েছিল। এছাড়া আরও বক্তব্য এসেছে। তবে যেহেতু কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, সেকারণ এ বিষয়ে আমাদের চুপ থাকাই শ্রেয়।

হাবিল ও কাবিল এর কাহিনী...

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, এবং তাদের সামনে আদমের দু' পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথ ভাবে পড়ে শোনাও, যখন তাদের প্রত্যেকে একেকটি কোরবানি পেশ করেছিল এবং তাদের একজনের কোরবানি কবুল হয়েছিল অন্যজনের কবুল হয়নি। সে (দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে) বলল, আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব।প্রথমজন বলল আল্লাহ তো মুত্তাকিদের পক্ষ হতেই কুরবানী কবুল করেন।

তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। আমি চাই তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপ ভার

বহন কর এবং জাহান্নামিদের মধ্যে গণ্য হও আর এটাই জালিমদের শাস্তি। পরিশেষে তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করলো সুতরাং সে তার ভাইকে হত্যা করে ফেলল এবং অকৃতকার্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করবে তারা তাকে দেখানোর লক্ষ্যে মাটি খনন করতে লাগলো।এটা দেখে সে বলে উঠলো, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকটির মতো হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি! এভাবে পরিশেষে সে অনুতপ্ত হলো।(সূরা মায়িদা - ২৭-৩১)মুফাসসিরগণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও আরও কতিপয় সাহাবীর সূত্রে এ কুরবানীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, আদম আ এর দুই পুত্র ছিল । একজনের নাম হাবিল অন্যজনের নাম কাবিল । তার স্ত্রীর গর্ভে প্রতিবার দুটি যমজ সন্তানের জন্ম হত। একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাদের দুজনের পরস্পরে বিবাহ জায়েজ ছিল না। কিন্তু এক গর্বের পুত্রের সাথে অপরগর্ভের কন্যার বিবাহ হালাল ছিল । কাবিলের সাথে যে কন্যার জন্ম হয় সে ছিল রূপসী কিন্তু জমজ হওয়ার কারণে কাবিলের সাথে তার বিবাহ জায়েজ ছিল না। তা সত্ত্বেও কাবিল গো ধরে বসে ছিল তাকেই বিবাহ করবে । হাবিলের পক্ষে সে মেয়ে হারাম ছিল না। তাই সে তাকে বিবাহ করতে চাচ্ছিলো। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করবে। আল্লাহ তাআলা যার কুরবানি কবুল করবেন তার দাবি ন্যায্য মনে করা হবে। সুতরাং উভয়ে কুরবানি পেশ করল। বর্ণনায় আছে যে, হাবিল একটি দুম্বা কুরবানি দিয়েছিল আর কাবিল পেশ করেছিল কিছু কৃষিজাত ফসল। সেকালে কুরবানীর কবুল হওয়ার আলামত ছিল এই যে, কুরবানী কবুল হলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। অতঃপর আসমান থেকে আগুন আসলো এবং হাবিলের কোরবানি জ্বালিয়ে দিল। এভাবে প্রমাণ হলো যে তার কুরবানী কবুল হয়েছে। কাবিলের কুরবানী তেমনই পড়ে থাকলো অর্থাৎ তার কুরবানী কবুল হয়নি। তখন কাবিল ঈর্ষাকাতর হল এবং একপর্যায়ে হাবিলকে হত্যা করে ফেলল। কাবিলের দেখা এটাই যেহেতু ছিল মৃত্যুর প্রথম ঘটনা। তাই লাশ দাফনের নিয়ম তার জানা ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা একটি কাক পাঠিয়ে দিলেন। কাকটি মাটি খুঁড়ে একটা মৃত কাক দাফন করছিল। এটা দেখে কাবিল কেবল লাশ দাফনের নিয়মই শিখলো না, নিজ অজ্ঞতার কারণে লজ্জিতও হল।

✍ আদম আ. এর মৃত্যু...

উবাই ইবনে কা'ব রা. হতে বর্ণিত, আদম আ.এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, "আমার জান্নাতের ফল খেতে ইচ্ছা হয়েছে।" ফলে তারা
ফলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। পথে তাদের সঙ্গে কতিপয় ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ফেরেশতাগণ তাদের বললেন, হে আদমপুত্রগণ! তোমরা কি চাও এবং কি খুজছো? উত্তরে তারা বললেন, আমাদের পিতা অসুস্থ । তিনি জান্নাতের ফল খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন । এ কথা শুনে ফেরেশতাগণ বললেন তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পিতার ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এসেছে ।ফেরেশতাগণ আদম আ.এর কাছে এলে হাওয়া আ. তাদের চিনে ফেলেন এবং আদম আলাই সাল্লাম কে জড়িয়ে ধরেন । তখন আদম আলাইহিস সালাম তাঁকে সরে যেতে বললেন।

ফেরেশতাগণ তাঁর জান কবজ করে নিয়ে তাঁকে গোসল দেন। কাফন পরান ও সুগন্ধি মাখিয়ে দেন। তার জন্য বগলি কবর খুঁড়ে তার জানাজার নামাজ আদায় করেন । এরপর তাঁকে কবরে রেখে দাফন করেন । তারপর তারা বললেন, "হে আদম সন্তানগণ! এই হল তোমাদের দাফনের নিয়ম।"

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হ’ল জুম‘আর দিন। এ দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে...’।(৫) আদম (আঃ)-কে এক হাজার বছর বয়স দেওয়া হয়েছিল। রূহের জগতে দাঊদ (আঃ)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর তাকে দান করেন। ফলে অবশিষ্ট ৯৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।(৬)

✍ আদম আ. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব...

আদম আ: মানবজাতির পিতা এবং ইসলামে তাঁকে মানুষের নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী। আল্লাহ তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেন। কুরআনে বলা হয়েছে, “তিনি যখন তাঁকে (আদমকে) সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকিয়ে দিলেন...” (সূরা সাদ: ৭২)। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতির জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দিয়েছেন এবং নবুওয়াতের ধারা শুরু করেছেন। সুতরাং, হযরত আদম আ: ছিলেন আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ একজন বান্দা, যিনি জ্ঞান ও তাওহিদের শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হন। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. কে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাদের সম্মুখে তুলে ধরেন এবং তাঁর মর্যাদা প্রদর্শনেরজন্য ফেরেশতাদের তাঁকে সেজদা করার আদেশ করেন। আশরাফুল মাখলূক্বাত’ বা সেরা সৃষ্টি হিসাবে আল্লাহ তাআলা আদম ও বনু আদমকে সৃষ্টি করেন এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً- (الإسراء-٧٠

‘আমরা বনু আদমকে উচ্চ সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থল ও জলপথে বহন করে নিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র বস্তু সমূহ হ’তে খাদ্য দান করেছি এবং আমাদের বহু সৃষ্টির উপরে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছি’ (সূরা ইসরা: ৭০)।

রেফারেন্স:

১. নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ ‘বিবাহ’ অধ্যায় **১০**ম অনুচ্ছেদ।

২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘ওয়াসওয়াসা’ অনুচ্ছেদ।

৩. সহীহ বুখারী- হাদীস নং: **১৩৩১**

৪. আহমাদ, মিশকাত হা/**১২১** ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

৫. মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/**১৩**৫৯; সনদ ছহীহ, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘জুম‘আ’ অনুচ্ছেদ।

৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/**১১**৮ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, তিরমিযী হা/৩০৭৬ ‘তাফসীর সূরা আ‘রাফ’। একই হাদীছ মিশকাত হা/৪৬৬২ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘সালাম’ অনুচ্ছেদে এসেছে। যেখানে ‘আদম তার বয়স থেকে ৬০ বছর দান করেন’ বলা হয়েছে। তিরমিযী হাদীছটিকে ‘হাসান গরীব’ বলেছেন ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তোহফা উভয়ে বলেন যে, ‘৪০ বছর দান করার হাদীছ অগ্রগণ্য (الأرجح)। দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫০৭২-এর ব্যাখ্যা।

হযরত ইদ্রিস আ:

✎ ইদ্রিস আ: এর পরিচয়...

হযরত ইদ্রিস আ: এর নাম ও বংশ পরিচয় এবং তাঁর যুগ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী । তিনি নূহ আ: এর আগের নবী ছিলেন না পরের নবী ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে । একদল স্কলারদের মতে ইদ্রিস আ: ছিলেন শীষ আ: ও নূহ আ: এর মাঝখানে প্রেরিত নবী । একদল বলেন, তিনি ছিলেন নূহ আ: এর দাদা। তার নাম আখনুখ । ইদ্রিস তাঁর উপাধি। অথবা আরবি ভাষায় ইদ্রিস আর হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষায় তাঁর নাম আখনুখ । আরেকদল বলেন , ইদ্রিস আ: ছিলেন বনু ইসরাঈল জাতির নবী ।

✎ কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইদ্রিস আ: ...

হযরত ইদ্রিস আ: এর প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের দুটি জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। সূরা মারইয়াম এ আল্লাহ তা'আলা বলেন ,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا -ً

আর স্মরণ করুন এই কিতাবে ইদ্রিসকে , তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী ; আর আমরা তাকে উন্নত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায় । (সূরা মারইয়াম:৫৬-৫৭)
পবিত্র কুরআনের অপর স্থানে উল্লেখ রয়েছে ,

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

এবং ইসমাঈল, ই'দ্রীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী।(সূরা আম্বিয়া:৮৫)
বুখারী ও মুসলিমের মেরাজের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে , নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস আলাইহিস সালাম এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ।
তাফসীর আল কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে , ইদ্রিস আ: হচ্ছেন ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি যিনি লিখার সূচনা করেন।আল্লাহ্ তাআলার ইলহাম মতে, তিনিই বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন । তার পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাক হিসেবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত । ইদ্রিস আ:

লোহা দিয়ে অস্ত্র তৈরীর পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন । যার মাধ্যমে তিনি কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারেন এবং কিছু উলামাদের মতে তিনি ছিলেন প্রথম নবী যিনি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার বিষয়টি আরম্ভ করেন । বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইদ্রিস আ: হ'লেন প্রথম মানব, যাঁকে মু'জেযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল।

✎ ইদ্রিস আ: এর মৃত্যু...

ইদ্রিস আলাইহিস সালামের মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন ও সহিহ হাদিসে সরাসরি বিস্তারিত কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। তবে ইসলামী ঐতিহ্যে কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা ঐতিহাসিক সূত্র এবং তাফসিরকারকদের বর্ণনায় পাওয়া যায়।
তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়, তিনি একবার একজন ফেরেশতার সাথে চতুর্থ আসমানে যান । অতঃপর চতুর্থ আসমানেই মালাকুল মাউত তাঁর রুহ নিয়ে যান।

হযরত নূহ আ:

✍ নূহ আ: এর পরিচয় ও আবির্ভাবের সময়কাল...

মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ আ. ছিলেন পিতা আদম -এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ । নূহ আ: ও আদম আ-এর মধ্যে সময়ের ব্যাপারে ইসলামী সূত্র এবং ইতিহাসে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। সাধারণত হাদিস ও ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে, আদম আ: পৃথিবীতে প্রথম মানব এবং নবী ছিলেন। আর নূহ আ: ছিলেন তার কয়েক প্রজন্ম পরের নবী। তিনি ছিলেন দুনিয়াবাসীর নিকট ১ম রাসূল । সহি বুখারীর হাদিসে উল্লেখ আছে, নবী মুহাম্মাদ সা: বলেছেন, আদম আ: এবং নূহ আ:-এর মধ্যে প্রায় ১০টি প্রজন্মের ব্যবধান ছিল। তবে এখানে প্রজন্ম মানে ঠিক কত বছর সেটি সুস্পষ্ট নয়। কিছু ব্যাখ্যাকারীর মতে, এটি কয়েক হাজার বছর হতে পারে । আল্লাহ্ই ভালো জানেন । কুরআন মাজীদ দ্বারা জানা যায়, এ দীর্ঘকাল পরিক্রমায় মূর্তি পূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল । হযরত নূহ আ: এর কওম ও বিভিন্ন রকম মূর্তি গড়ে নিয়েছিল । ফলে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। তখন আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য হযরত নূহ আ: কে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন ।

নূহ আ: ৯৫০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন । এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি নূহ কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর । অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করল যেহেতু তারা ছিল জালিম।(সূরা আনকাবুত: ১৪)। উল্লেখ্য যে, আদম ও নূহ আ:-এর দীর্ঘ বয়স আল্লাহর বিশেষ দান ও তাঁদের মু'জেযা স্বরূপ ছিল।

✍ পবিত্র কুরআন ও হাদিসে হযরত নূহ আ:...

হযরত নূহ আ: সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ২৮ টি সূরায় ৮১ টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (১) তাঁর নামে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে একটা সম্পূর্ণ সূরা "সূরা নূহ" নাযিল করেছেন। এই সূরায় নূহ আ: এর দাওয়াতি কার্যক্রম ও তার দোয়া সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা সূরা আ'রাফ এ বলেন, আমি নূহ কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল , হে আমার সম্প্রদায়ের লোক ! আল্লাহর ইবাদত করো । তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই । নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি আপতিত হবে । তার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বলল, আমরা তো নিশ্চয়ই গ্রুপেই দেখছি তুমি

স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছো । নূহ উত্তর দিল , হে আমার সম্প্রদায় ! কোন বিভ্রান্তে আমাকে স্পর্শ করেনি । প্রকৃতপক্ষে আমি রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত রাসুল । আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করি । আল্লাহর পক্ষ হতে আমি এমন বিষয় জানি , যা তোমরা জানো না । তবে কি তোমরা এই কারণে বিষয় বোধ করছ যে , তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে , যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরা (মন্দ কাজ থেকে) বেঁচে থাকো, আর যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হয় তথাপি তারা নূহকে কে মিথ্যাবাদী বলল সুতরাং আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করি আর , যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করি । নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ লোক। (সূরা আ'রাফ: ৫৯-৬৪)
এছাড়াও সূরা হুদ এ নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।
হযরত আদম আ :পর হযরত নূহ আ: কে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস দ্বারা তা সুস্পষ্ট প্রমাণিত । মুসলিম শরীফের শাফায়াতের অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা রা: থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়াতে বর্ণিত আছে,
" হে নূহ ! তোমাকে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাসূল বানানো হয়েছে । "

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ: কে রাসূল হিসেবে প্রেরণের পর, তিনি তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও তাওহীদের দাওয়াত দেন । অনুরূপভাবে , অন্যান্য পয়গম্বরগণও তাওহীদ ও অন্যান্য বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন । তাঁরা সকলে তাঁরই বংশধর ছিলেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
"তার (নূহ আ:) এর বংশধরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি ধ্বংস-পরম্পরায় ।" (সূরা সাফফাত: ৭৭)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
"আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি ।" (সূরা হাদীদ: ২৬)
নূহ আ-এর চারটি পুত্র ছিলঃ সাম, হাম, ইয়াফিস ও ইয়াম অথবা কেন‘আন। প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন তার পিতা নূহ আ: এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়।
হযরত সামুরা রা: থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, সাম আরবের আদি পিতা, হাম আবিসিনিয়ার আদি পিতা, এবং ইয়াফিস রুমের আদি পিতা ।

✍ স্বীয় কওমের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত...

পৃথিবীতে আগমনকারী সকল নবী রাসূলের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ ছিল । আল্লাহ তাআলা তাঁদের মানবজাতির হেদায়েতের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। সকল নবী রাসূলগণের মতো নূহ আলাইহিস সালাম এর উপর ও ছিল দাওয়াতের নির্দেশ । কাজেই তিনি তার সম্প্রদায় কে বলেছিলেন, আমি তোমাদের জন্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সতর্ককারী । যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির ভয় করি । (সূরা হুদ: ২৫-২৬)

সূরা নূহে সবিশেষ স্বজাতির প্রতি তাঁর দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে । তিনি রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন । তিনি কখনো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আবার কখনো আল্লাহ তায়ালার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝিয়েছেন । তিনি তাদেরকে বলতেন, "নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো । নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল । তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এবং তোমাদের ধন- সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন। (সূরা নূহ: ১০-১২)
তিনি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন নিয়ামত ও তাঁর ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন । বলতেন, তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহর মহিমাকে বিলকুল ভয় পাও না ? অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ধাপে ধাপে । তোমরা কি দেখনি আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশকে উপর-নিচ স্তর বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে চন্দ্রকে আলোকরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপিত করেছেন । এবং তোমাদেরকে ভূমি হতে উৎকৃষ্ট পন্থায় উদ্ভূত করেছেন । তারপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় তার ভিতরই পাঠাবেন এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি বের করে আনবেন। আল্লাহই ভূমিকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তার উন্মুক্ত পথে চলাফেরা করতে পারো। (সূরা নূহ: ১৩-২০)

কিন্তু তার কওমের যে নেতৃবর্গ কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলতে লাগলো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি , এর বেশি কিছু নয় আমরা আরো দেখছি , তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন এবং তা ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তো তোমাদের উপরে তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছি না বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী ।(সূরা হুদ: ২৭) সূরা মুমিনুন এ বর্ণিত আছে, তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানগণ একে অপরকে বলল এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া তো কিছু নয় । সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায় ।

আল্লাহ চাইলে কোন ফেরেশতাই নাযিল করতেন । আমরা তো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কখনো শুনিনি। (প্রকৃতপক্ষে এই লোকটির ব্যাপার এই যে,)সে এমনই এক লোক, যার উন্মত্ততা দেখা দিয়েছে সুতরাং তার ব্যাপারে তোমার কিছুকাল অপেক্ষা করে দেখো । (সূরা মুমিনুন:২৪-২৫) নুহ আ: তাদেরকে এও বোঝালেন যে এই দাওয়াত বা তাবলীগের বিনিময়ে তিনি তাদের কাছে কোন সম্পদ চান না । তিনি বলেন, "আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নয়।"(সূরা হুদ: ২৯) সম্পদশালী ও প্রভাবশালী কাফেররা নুহ আ: কে বলতো, "তুমি ওই অল্প আয়ে নিম্ন পেশার অল্পবুদ্ধির নিচুস্তরের লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলে আমরা তোমার কাছে বসতে ও তোমার কথা শুনতে পারি ।" অতঃপর তিনি বলেন, "যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা অজ্ঞতাসুলভ কথা বলছ । হে আমার সম্প্রদায় ! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই , তবে আমাকে আল্লাহর থেকে কে রক্ষা করবে ? তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না ? আমি তোমাদেরকে বলছি না যে আমার হাতে আল্লাহর ধন ভান্ডার আছে এবং এটাও নয় যে , আমি গায়েব জানি এবং আমি একথাও বলছি না যে , আমি কোন ফেরেশতা । তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্পর্কে আমি এ কথা বলতে পারি না যে , আল্লাহ তাদেরকে কোন মঙ্গল দান করবেন না । তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহই সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন । আমি তাদের সম্পর্কে এরূপ কথা বললে নিশ্চয়ই আমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হব । (সূরা হুদ: ২৯-৩১)

এভাবে তাঁর কওম তাঁর দাওয়াত তো কবুল করলোই না বরং তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো এবং তাঁর সকল আহ্বান ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করলো । তখনকার অবস্থায় এরূপ ছিল যে , তার দাওয়াতে অতিষ্ট হয়ে তারা তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত । কখনো কানে আঙ্গুল দিত । কখনো বা তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত । পরিশেষে তারা বিরক্ত হয়ে বলল , হে নূহ ! তুমি আমাদের সাথে বাদানুবাদ করছো এবং আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিবাদ করেছো । অতএব যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ , তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো যদি তুমি সত্যবাদী হও । (সূরা হুদ: ৩২) তাদের সরদার প্রধানরা সাধারণ লোকদেরকে বলতো , "তোমরা কিছুতেই ওয়াদ্দ , সুওয়া , ইয়াগুস , ইয়াউক ও নাসর কে পরিত্যাগ করবে না ।" ওয়াদ্দ , সুওয়া , ইয়াগুস , ইয়াউক ও নাসর হলো কতগুলি মূর্তির নাম । সেই সময়কালে তারা এসবের পূজা করত ।

নূহ আ: ২০ বা ৩০ বছর নয় বরং দীর্ঘ সাড়ে ৯০০ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও যখন তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখলেন না, তখন তিনি তাদের কার্যকলাপ ও উৎপীড়নে ব্যথিত

হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত দিন (সত্যের দিকে) ডেকেছি । কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করেছে । আমি যখনই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা তাদের কানে আঙ্গুল রেখেছে, নিজেদের কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে (নিজেদের কথার উপর জিদ বজায় রেখেছে) এবং শুধু অহমিকাই প্রকাশ করেছে । অতঃপর আমি তাদেরকে জোর কণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি । তারপর আমি প্রকাশ্যেও তাদের সাথে কথা বলেছি এবং গোপনে গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি ।" (সূরা নূহ: ৫-৯) তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমার সম্প্রদায় তো আমার অবাধ্যতা করেছে এবং তারা অনুসরণ করেছে এমন লোকের (অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গের) যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি ।" (সূরা নূহ: ২১) তিনি আরও বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না । আপনি তাদেরকে বাকি রাখলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি জন্ম নেবে তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোর কাফেরই হবে ।" অতঃপর আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম এর কাছে ওহী পাঠান। ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানান যে, এসব লোক ঈমান আনার নয় । তাঁর সম্প্রদায়ের যারা পূর্বে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না । সুতরাং এজন্য তিনি যেন দুঃখ না পান ।

✐ নৌকা তৈরি ও প্লাবনের ঘটনা...

আল্লাহ্ পাক নূহ আ: এর দুআ কবুল করলেন এবং তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাদের অবাধ্যতার শাস্তি ঘোষণা করলেন । তিনি তাঁকে একটি নৌকা বানাতে আদেশ করলেন । যাতে সেই নৌকায় চড়ে তিনি ও তাঁর অনুসারী মুমিনগণ আত্মরক্ষা করতে পারেন । কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, সর্বপ্রথম নৌকা তৈরির কাজ করেছিলেন হযরত নূহ আ: । তাঁর তৈরি নৌকাটি ছিলো তিন তলা বিশিষ্ট । আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেন, "সুতরাং, আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুসারে নৌযান নির্মাণ করো । তারপর যখন আমার হুকুম আসবে এবং তান্নুর উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া নিয়ে তা সেই নৌযানে তুলে নিও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তবে যাদের বিরুদ্ধে আগেই সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে তাদেরকে নয় । আর সে জালিমদের সম্বন্ধে আমার সাথে কোনো কথা বলবে না । নিশ্চয়ই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হবে ।"(সূরা মুমিনুন: ২৭) এখানে "তান্নুর" এর এক অর্থ চুলা, অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ । কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সময়কার প্লাবন শুরু হয়েছিল চুলা বা ভূগর্ভ থেকে

। আর প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া তুলে নিতে বলা হয়েছিল এই কারণে যাতে মানুষের প্রয়োজনীয় জীবজন্তুর বংশধারা রক্ষা পায় । সুতরাং নূহ আ. আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা বানাতে শুরু করলেন । নৌকা বানানোর সময়, যখনই তাঁর সম্প্রদায়ের কতক সর্দার তার কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা তাঁকে নিয়ে উপহাস করত । তারা বলতো, "দেখো তিনি এখন অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নৌকা বানানো শুরু করে দিয়েছেন অথচ দূরদূরান্তে কোথাও পানির চিহ্ন নেই ।" (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন: সূরা হুদ ৩৮নং আয়াতের ব্যাখ্যা) তখন নুহ আলাই সালাম তাদেরকে পাল্টা জবাব দিয়ে বলতেন, "তোমাদের প্রতি আমাদের ও হাসি আসছে এই কারণে যে, তোমাদের মাথার উপর আজাব এসে পড়েছে অথচ তোমরা এখনও হাসি তামাশায় লিপ্ত রয়েছো । অতঃপর একদিন নুহ আ. প্রথম আল্লাহর প্রতিশ্রুত আজাব নাযিল হওয়ার আলামত দেখতে পেলেন। অর্থাৎ তান্নুর বা ভূগর্ভ হতে পানি উত্থিত হওয়া আরম্ভ করল এবং অতি দ্রুত তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল । সেই সঙ্গে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ হতে লাগলো । তখন নূহ আ: তাঁর সাথীদের নৌকায় আরোহন করতে বললেন । তারা সকলে তাতে আরোহন করলেন । সে নৌকা পর্বত প্রমাণ তরঙ্গ রাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল । হযরত নূহ আ: এর অন্যান্য পুত্রগণ নৌকায় চর হয়েছিল কিন্তু তার কিনাআন নামকপুত্র সওয়ার হয়নি । তিনি তাকে ডেকে বললেন, "বাছা আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না।" সে বলল, আমি এখনই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে । নূহ আ: বললেন, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কাউকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেবল সেই ছাড়া যার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন অতঃপর ঢেউ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সেও নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো । তিনি তার পুত্রের ক্ষমা ও মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন ! এবং নিশ্চয়ই তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক । আল্লাহ তায়ালা উত্তরে জানালেন, সে কাফের এবং তার ভাগ্যে ঈমান নেই আর এ কারণে বাস্তবিকপক্ষে সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় । তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর স্ত্রীও শেষ পর্যন্ত কাফেরই ছিল । (সূরা তাহরীম এর ১০ নং আয়াতে তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে) সে তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি । সুতরাং সেও সেই মহাপ্লাবনে ধ্বংস হলো ।

পাহাড় সমান ঢেউয়ের মধ্যে নূহ আ. তাঁর সাথীদের নিয়ে ভ্রমণ করলেন । অবশেষে আল্লাহ তায়ালা হুকুম করলেন মাটি যেন তার পানি শুষে নেয় এবং আকাশ যেন তার বৃষ্টি থামিয়ে দেয় । সুতরাং পানি নেমে গেল । আল্লাহ তায়ালার আদেশে নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থেমে গেল।(সূরা হুদ:৪৪) সেই মহাপ্লাবনে সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হলো । আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালামকে বলেন, "হে নূহ ! আমার নিরাপত্তায় অবতরণ কর এবং

আমার বরকত তোমার ও তোমার উম্মতের উপর এবং এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে যাদের আমি কিছুদিন তাদের জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ হতে তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি স্পর্শ করবে ।"(সূরা হুদ:৪৮)

✍ নূহ আ: এর রোজা পালন...

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ছাড়া সারা বছর রোজা রাখতেন । (ইবনে মাজাহ)

✍ নূহ আ: এর মর্যাদা...

পূর্ববর্তী সকল নবীর দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি দাওয়াত। মানুষের সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই হ'ল প্রকৃত অর্থে ইক্বামতে দ্বীন । নূহ আলাইহিস সালাম ইসলামের প্রাথমিক যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নবী এবং মানবজাতির পথপ্রদর্শক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রথম ক'জন নবীর একজন যাদেরকে “উলুল আযম” বলা হয়। উলুল আযম নবীরা হলেন সেই মহান নবীগণ, যাঁরা ধৈর্য ও সাহসিকতার এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন এবং বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নূহ আ: কে এমন এক জাতির কাছে পাঠিয়েছেন যারা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি গুলোর মধ্যে একটি । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আদ ও সামুদ জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ

তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন,

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ

এবং সামুদকেও; অতঃপর কাউকে অব্যহতি দেননি।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ

এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য। (সূরা নাজম: ৫০-৫২)

নূহ আলাইহিস সালাম প্রায় ৯৫০ বছর তাঁর জাতির কাছে সত্যের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জাতির অধিকাংশই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শিরক ও অন্যায়ে লিপ্ত ছিল। তবুও তিনি নিরলসভাবে আল্লাহর পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই নূহ ছিল কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আল-ইসরা: ৩)

নূহ আ: -এর জাতি যখন অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তাদের শাস্তি হিসেবে মহাপ্লাবন পাঠান এবং নূহ আ: ও তাঁর অনুসারীদের একটি নৌকায় রক্ষা করেন। এই ঘটনাটি কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; এটি একটি শিক্ষণীয় কাহিনি এবং আল্লাহর শক্তি ও নবীর প্রতি সহমর্মিতার প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে একান্ত ভক্তি ও ধৈর্যের জন্য বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে মুসলিম উম্মাহকে তাঁর জীবনের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

☞ রেফারেন্স:

১. যথাক্রমে আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪; নিসা ৪/১৬৩; আন'আম ৬/৬, ৮৪; আ'রাফ ৭/৫৯, ৬৯, ১৩৩= ৩; তওবা ৯/৭০; ইউনুস ১০/৭১; হূদ ১১/২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯= ৮; ইবরাহীম ১৪/৯; ইসরা ১৭/৩, ১৭; মারিয়াম ১৯/৫৮; আম্বিয়া ২১/৭৬; হজ্জ ২২/৪২; মুমিনূন ২৩/২৩; ফুরক্বান ২৫/৩৭; শো'আরা ২৬/১০৫, ১০৬, ১১৬; আনকাবূত ২৯/১৪-১৫; আহযাব ৩৩/৭; ছাফফাত ৩৭/৭৫, ৭৯; ছোয়াদ ৩৮/১২; গাফের/মুমিন ৪০/৫, ৩১-৩৩= ৪; শূরা ৪২/১৩; ক্বাফ ৫০/১২; যারিয়াত ৫১/৪৬; নাজম ৫৩/৫২; ক্বামার ৫৪/৯-১৬= ৮; হাদীদ ৫৭/২৬; তাহরীম ৬৬/১০; নূহ ৭১/১-২৮= ২৮। সর্বমোট = ৮১ টি।

হযরত হুদ আ:

✍ হুদ আ: এর পরিচয়...

হযরত হুদ আ: শক্তিশালী আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । আদ ছিল আরবদের প্রাথমিক যুগের একটি জাতি । আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ-এর পরে কওমে ‘আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি । হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনুমানিক দুই হাজার বছর পূর্বে ইয়ামানের হাজরামাউত অঞ্চলে তাদের বসবাস ছিল ।(১)
আদ জাতি যে অঞ্চলে বাস করত, সেখানে বহু টিলা ছিল । কারো মতে, সেই অঞ্চলটির নাম আহকাফ । এটি ইয়ামানে অবস্থিত । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা আহকাফের ২১ নং আয়াতে বলেছেন, "এবং আদ জাতির ভাই (হযরত হুদ আ:) এর বৃত্তান্ত উল্লেখ কর, যখন সে তার সম্প্রদায়কে আঁকাবাঁকা টিলাময় ভুমিতে সতর্ক করেছিল ।"
বর্তমানে সেখানে কোন লোকবসতি নেই । ঐতিহাসিকগণের মতে, সাম ইবনে নূহের বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় আদ সম্প্রদায় । এবং তারা ছিল সবচেয়ে প্রাচীন আরব জাতি । যাদেরকে বলা হয়ে থাকে আল-আরবুল বায়িদা বা বিলুপ্ত আরবেরা । তাদের মূল শহরের নাম ছিল "ইরম" । "ইরম" আদ জাতির উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নাম । তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাজরে উল্লেখ করে বলেছেন,

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ-

ইরম যারা উঁচু স্তম্ভের অধিকারী ছিল । যাদের সমান পৃথিবীতে আর কোন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি । (সূরা ফাজর:(৭-৮)
ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন, আদ গোত্র ছিল ইরম বিন আউস বিন সাম বিন নূহের বংশধর । অর্থাৎ পুরো আদ সম্প্রদায় ছিল নূহ আলাইহিস সালাম এর পুত্র সামের বংশধর । এবং তাদের পূর্বপুরুষ "ইরম" এর নামে নাম রাখা তারা যে শহর নির্মাণ করেছিল সে শহরটির বিশেষত্ব ছিল বিস্ময়কর সব স্তম্ভ বা পিলার । দৈহিক শক্তি ও পাথর শিল্পে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল ।
হযরত হূদ (আঃ) ও কওমে ‘আদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৭টি সূরায় ৭৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।(২)

✍ **স্বীয় জাতির প্রতি হুদ আ: এর দাওয়াত...**

নূহ আ: এর সময়ের ধ্বংসাত্মক প্লাবনের পর তাঁর বংশধরেরা নতুন করে সমাজ গঠন করলেন । তাঁর পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিস এর বংশধরেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেন এবং কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত কোন শির্ক ছিল না । এরপর শয়তান আবারো সেই সমাজে শিরকের বীজ বুনতে শুরু করলো । আদ জাতির নির্মাণ শিল্পে বিশেষ খ্যাতি ছিল । কিন্তু তারা আল্লাহ তায়ালা কে এমন ভাবে অমান্য করতে লাগলো যে, তাদের সেই শৈল্পিক দক্ষতা আক্ষরিক অর্থে ধুলোয় মিশে গেল । কালক্রমে তারা মূর্তি বানিয়ে তার পূজা শুরু করে দিল । ফলে শিরক তাদের ভেতর গভীরভাবে প্রবেশ করল । অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসুল হিসেবে বেছে নিলেন । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না?

হুদ আ: অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ সম্প্রদায়কে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তাদের সামনে তাওহীদের শিক্ষা পেশ করে আল্লাহ তায়ালার বান্দা হওয়ার আহ্বান জানালেন । কিন্তু তার সম্প্রদায়ের সরদার ব্যক্তিগণ তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো । তারা বলতে লাগলো, সে যেহেতু আমাদের দেবদেবীদের পূজা করে না, তাই দেবতাদের অভিশাপে তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে । তারা বলল, আমরা তো নিশ্চিতভাবে তোমাকে নির্বুদ্ধিতার ভেতর দেখছি এবং নিশ্চয়ই আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যুক লোক । জবাবে হুদ আ: বলেন, হে আমার সম্প্রদায় ! আমার কোন নির্বুদ্ধিতা দেখা দেয়নি । বরং, আমি রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসুল । আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা সমূহ পৌঁছে থাকি এবং আমি তোমাদের এক বিশ্বস্ত কল্যাণকামী । (সূরা আরাফ: ৬৬-৬৭)

হূদ আ: তাঁর জাতিকে তাদের বিলাসোপকরণ ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যেমন সূরা শো'আরায় ১২৮-১৩৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُوْنَ، وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَاتَّقُوا الَّذِيْ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ، وَجَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ، إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ، قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ، إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ، فَكَذَّبُوْهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِيْنَ- (الشعراء-١٢٨-١٣٩)

"তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ ? (যেমন সুউচ্চ টাওয়ার, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি)। এবং তোমরা বড় বড় প্রাসাদ সমূহ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে । এছাড়া যখন তোমরা কাউকে আঘাত হানো, তখন নিষ্ঠুর-যালেমদের মত আঘাত হেনে থাক । অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । তোমরা ভয় কর সেই মহান সত্তাকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ঐসব বস্তু দ্বারা যা তোমরা জানো । তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন গবাদি পশু ও সন্তানাদি দ্বারা এবং উদ্যান ও ঝরণা সমূহ দ্বারা । (অতঃপর হূদ (আঃ) কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়ে বললেন,) আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি । জবাবে কওমের নেতারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও বা না দাও সবই আমাদের জন্য সমান । তোমার এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-অভ্যাস বৈ কিছু নয় । আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না । (আল্লাহ বলেন,) অতঃপর (এভাবে) তারা তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল । ফলে আমরাও তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এর মধ্যে (শিক্ষণীয়) নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না । "

বস্তুত অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলে হুদ আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো ।

প্রথমদিকে আল্লাহ তায়ালা এই সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করেছিলেন, যাতে তারা তাদের উদাসীনতা ত্যাগ করে কিছুটা সচেতন হয় । এ সময় হুদ আ: তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ দুর্ভিক্ষ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক কষাঘাত স্বরূপ । তারা যদি মূর্তিপূজার ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হয়, তবে এ খরা ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং আল্লাহ তাদের প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন । তারা তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ করলো না । বরং তারা তাঁর কাছে মুজিযা বা নিদর্শন পেশ করার দাবি করল । কিন্তু তাদের এ দাবি পূরণ করা হয়নি কেননা নবীগণ নিজেদেরকে মানুষের ইচ্ছামত মুজিযা দেখানোর কাজে উৎসর্গ করতে পারেন না । আল্লাহ যখন চান তখনই কেবল তাঁরা মুজিযা প্রদর্শন করে থাকেন । তারা বলল,"তুমি আমাদের কাছে কোন উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে আসনি এবং আমরা কেবল তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করার নই এবং আমরা তোমার কথায় ঈমানও আনতে পারি না ।"(সূরা হুদ: ৫৩) এভাবে তারা সরাসরি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানালো ।

✍ আদ সম্প্রদায় এর উপর আল্লাহর প্রেরিত আযাব...

সূরা হা-মীম সাজদায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۱۵﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَ هُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۶﴾

"অতঃপর আদ এর ঘটনা তো এই যে, তারা পৃথিবীতে অন্যায় দম্ভ প্রদর্শন করতে লাগলো এবং বলল শক্তিতে আমাদের উপরে কে আছে ? তবে কি তারা অনুধাবন করলো না যে,যেই আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শক্তিতে তিনি তাদের অনেক উপরে ? আর তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করতে থাকলো । সুতরাং আমি অশুভ কতক দিনে তাদের ওপর পাঠালাম প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া, তাদেরকে পার্থক্য জীবনে লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্য । আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো বেশি লাঞ্ছনাকর এবং তারা পাবে না কোন সাহায্য ।" (হা-মীম সাজদা: ১৫-১৬)

হুদ আ: বারবার তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তিরস্কার লাভ করা সত্ত্বেও যখন তাঁর সম্প্রদায়কে ক্রমাগত আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আগত শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন, তখন তারা বলল, "তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে আমাদের কে আমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করে দেবে ? আচ্ছা তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো ।" তখন হুদ আ: বললেন, (সে আযাব কখন আসবে এর) যথাযথ জ্ঞান আল্লাহর কাছে । আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তো তোমাদের কাছে তাই পৌঁছাচ্ছি । তবে আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায় । (সূরা আহকাফ:২২-২৩) অবশেষে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত শাস্তির দিন এসে উপস্থিত হলো। তারা একটি মেঘ খন্ড রূপে তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল । তখন তারা বলল, এটা মেঘ, যা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে । হুদ আ: বললেন, না , বরং এটাই সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে । এটা এক ঝড়ো হাওয়া, যার মধ্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি । (সূরা আহকাফ: ২৪) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বাতাসকে সরাসরি হুকুম করেন তা যেন প্রচন্ড বেগে তাদের উপর আঘাত হানে । তিনি হুদ আ: ও তার অনুসারীদের তা থেকে রক্ষা করলেন । আর যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আর আদ জাতি (এর বৃত্তান্ত হলো), তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এমন প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা যা আল্লাহ তাদের উপর প্রবাহিত রেখেছিলেন (একটানা) সাত রাত, আট দিন বিরামহীন ভাবে তখন তুমি দেখতে

পেতে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে ফাঁপা খেজুর কাণ্ডের মতো ।" (সূরা আল-হাক্ক: ৬-৭) অর্থাৎ তাদের ওপর যে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করা হয়েছিল তা সাত রাত আট দিন ধরে অব্যাহত ছিল । আদ জাতির লোকজন বিশাল দেহবিশিষ্ট ছিল । তাই তাদের ভূপাতিত দেহকে খেজুর গাছের কাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে । জাতি হিসেবে তারা এতটা শক্তিশালী ছিল অথচ অনন্তর তারা এমন হয়ে গেল যে তাদের আবাসস্থল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ।

হযরত হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারকথাগুলি সূরা হূদ-এর ৫০, ৫১ ও ৫২ আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, যা এক কথায় বলা যায়- তাওহীদ, তাবলীগ ও ইস্তেগফার। প্রথমে তিনি নিজ কওমকে তাদের কল্পিত উপাস্যদের ছেড়ে একক উপাস্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি ইবাদতের আহবান জানান, যাকে বলা হয় 'তাওহীদে ইবাদত'। অতঃপর তিনি জনজীবনকে শিরকের আবিলতা ও নানাবিধ কুসংস্কারের পংকিলতা হ'তে মুক্ত করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাদের নিকট আল্লাহর বিধানসমূহ পৌঁছে দিতে থাকেন। তাঁর এই দাওয়াত ও তাবলীগ ছিল নিরন্তর ও অবিরত ধারায় এবং যাবতীয় বস্তুগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে। অতঃপর তিনি জনগণকে নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও অন্যান্য কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে তওবা করার ও আল্লাহর নিকটে একান্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনার আহবান জানান।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে সকল নবীই দাওয়াত দিয়েছেন। মূলতঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি।

✐ হুদ আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা...

হুদ আ: ছিলেন আল্লাহর একজন অন্যতম সম্মানিত নবী, যাকে আদ জাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তাকে সত্যের পথে জাতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হুদ আ:-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমাদের জন্য শিক্ষা ও সতর্কবাণীর উৎস। হুদ (আঃ)-এর গল্পের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের দেখিয়েছেন যে, তার নবীগণ সবসময় সৎপথে আহ্বান জানান এবং আল্লাহর হুকুম মানতে জাতিকে উৎসাহিত করেন, এমনকি যদি তাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয় তবুও। তিনি সর্বদা আল্লাহ তাআলার একত্বের উপর অবিচল থেকে, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল রেখে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে নিজের কওমকে সঠিক পথে দাওয়াত দিয়ে গেছেন । হুদ আ: এর কওমের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত আযাব আমাদের এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অহংকার এবং

আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার পরিণতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে অর্থাৎ তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় ।

এক কথায়, হুদ (আঃ)-এর জীবনী থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো আল্লাহর একত্বে অবিচল থাকা, ধৈর্য ধারণ করা, অহংকার থেকে বাঁচা, এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখা। তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমাদেরকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানায় এবং সতর্ক করে।

☞ রেফারেন্স:

১. তাওযীহুল কুরআন: ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

২. যথাক্রমে: (১) আ'রাফ ৭/৬৫-৭২, (২) তওবা ৯/৭০, (৩) হূদ ১১/৫০-৬০, ৮৯, (৪) ইবরাহীম ১৪/৯, (৫) হজ্জ ২২/৪২, (৬) ফুরক্বান ২৫/৩৮, ৩৯, (৭) শো'আরা ২৬/১২৩-১৪০, (৮) আনকাবূত ২৯/৩৮, (৯) ছোয়াদ ৩৮/১২, (১০) গাফের/মুমিন ৪০/৩১, (১১) ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৩-১৬, (১২) আহক্বাফ ৪৬/২১-২৬, (১৩) ক্বাফ ৫০/১৩, (১৪) যারিয়াত ৫১/৪১, ৪২, (১৫) ক্বামার ৫৪/১৮-২২, (১৬) হা-ক্বক্বাহ ৬৯/৪-৮, (১৭) ফাজ্র ৮৯/৬-৮। সর্বমোট ৭৩।

হযরত সালেহ্ আ:

✎ সালেহ্ আ: এর পরিচয়...

নূহ আ: এর পুত্র সামের বংশধর ছিল ইরম। এক পুত্রের বংশধরদেরকে বলা হত "আদ-আল উলা" অর্থাৎ প্রথম আদ এবং দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরদেরকে বলা হত "আদ আস-সানি" অর্থাৎ দ্বিতীয় আদ । দ্বিতীয় আদের অপর নাম সামুদ । অর্থাৎ সামুদ ছিল আদ জাতিরই বংশধর । বিভিন্ন স্কলারদের মতে, আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার প্রায় ৫০০ বছর পরে আল্লাহ্ হযরত ছালেহ আ: কে কওমে ছামূদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরণ করেন ।(১) তাদের অবস্থান ছিল আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে । তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজ্র' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়ে থাকে। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও 'আদ জাতির মত শক্তিশালী জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। সূরা আরাফের ৭৪ নং আয়াতে তাদের পাহাড় কেটে নির্মিত যে ইমারতের কথা বর্ণিত হয়েছে আজও তার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায় । আদ জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সামুদ জাতি ছিল সবচেয়ে এগিয়ে । সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাচীন এই জাতির খোদাই কাজের নমুনা উদঘাটিত হয় । বুখারীর হাদিসে বর্ণিত আছে, ৯ম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার পথে মুসলিম বাহিনী হিজ্রে অবতরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে বলেন,

لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُم-

'তোমরা ঐসব অভিশপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করো না ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যতীত। যদি ক্রন্দন করতে না পার, তাহ'লে প্রবেশ করো না। তাহলে তোমাদের উপর ঐ গযব আসতে পারে, যা তাদের উপর এসেছিল'।**(২)**

রাসূলের এই বক্তব্যের মধ্যে সুক্ষ্ম তাৎপর্য এই যে, এগুলি দেখে যদি মানুষ আল্লাহর গযবে ভীত না হয়, তাহ'লে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে এবং ঐসব অভিশপ্তদের মত অহংকারী ও হঠকারী আচরণ করবে। ফলে তাদের উপর অনুরূপ গযব নেমে আসবে, যেরূপ ইতিপূর্বে ঐসব অভিশপ্তদের উপর নেমে এসেছিল। পার্থিব জীবন ও ভোগবাদীতাকে প্রাধান্য দিলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় । সামুদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছিল । নূহ আলাইহিস সালাম এর সেই মহা প্লাবনের কথা তখনও লোকমুখে আলোচিত হতো । আর আদ জাতির ধ্বংস তো তাদের কাছাকাছি সময়েরই ঘটনা । তবু এ থেকে তারা শিক্ষা না নিয়ে শিরকে বা মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়েছিল । এত নিকট ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়ার দোষে আল্লাহতাআলা

তাদের ধ্বংস করে দিতে পারতেন কিন্তু অসীম অনুগ্রহের মালিক তাদের কাছে একজন নবী পাঠালেন যার নাম সালেহ্ আ: ।

কওমে সামুদের প্রতি সালেহ্ আ: এর দাওয়াত...

ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২২টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।(৩)

সালেহ্ আলাইহিস সালাম এর দাওয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করে বলেন,

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُه ؕ

আর সামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। (সূরা আরাফ: ৭৩)

এ থেকে বোঝা যায় হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম প্রথমে তার কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শির্ক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত এবং তার প্রতি প্রেরিত বিধানসমূহের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানান । কিন্তু কওমের অধিকাংশ লোকই তার কথা প্রত্যাখ্যান করল । তাঁর সম্প্রদায়ের স্বনামধন্য ও শক্তিশালী নেতৃবর্গ যে সকল দুর্বল বা সাধারণ লোক ঈমান এনেছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "সালেহ্ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসুল?" তারা বলল, "নিশ্চয়ই আমরা তো তার মাধ্যমে প্রেরিত বাণীতে ঈমান রাখি ।" এরপর সেই দাম্ভিক লোকেরা বলল, "তোমরা যে বাণীতে ঈমান এনেছো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি ।" (সূরা আরাফ:৭৫-৭৬) মূলত তাদের সামাজিক মর্যাদা তাদেরকে এতটা অহংকারী করে তুলেছিল যে তারা সত্যকে নিরপেক্ষভাবে যাচাই না করে এই ব্যাপার নিয়ে চিন্তায় ছিল যে, তারা যদি সালেহ আ: এর বাণী গ্রহণ করে তবে তাদের সামাজিক অবস্থান নেমে আসবে কিনা । তারা বলল, হে সালেহ্! ইতঃপূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ছিলে যে, তোমাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল । আর তার পরিবর্তে তুমি কি করছ ? আশা তো ছিল তুমি জাতির নেতৃত্ব দেবে । বাপ-দাদাদের ঐতিহ্যকে আরও বহু দূরে এগিয়ে নেবে । অথচ আমাদের বাপ দাদাগণ যাদের উপাসনা করতো তুমি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ ? আমাদের বাপ-দাদারা যা করত তুমি তা ভুল দাবি করছো? তুমি যে বিষয়ের দিকে ডাকছো তাতে আমাদের এতটা সন্দেহ রয়েছে যে তা আমাদেরকে অস্থিরতার ভেতর ফেলে দিয়েছে । (সূরা হুদ: ৬২) তারা আরও বলল,‘আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তাহলে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত বলে গণ্য

হব। 'আমাদের মধ্যে কি কেবল তারই উপরে অহী নাযিল করা হয়েছে? আসলে সে একজন মহা মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক' । (সূরা ক্বামার:২৪-২৫) তারা সালেহ্ আ: কে বলল,

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ...

- 'আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি'... (নামল: ৪৭) ।

এরপরও সালেহ্ আলাইহিস সালাম হতাশ হলেন না । তিনি তাঁর দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন । তিনি তাদের ক্রমাগত বোঝাতে লাগলেন, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং পৃথিবীতে অশান্তির বিস্তার না করে । এ সম্পর্কে সূরা শুআরা তে বেশ কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে,

اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ﴿۱۴۳﴾ فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۴۴﴾ وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡہِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۴۵﴾ اَتُتۡرَکُوۡنَ فِیۡ مَا ہٰہُنَاۤ اٰمِنِیۡنَ ﴿۱۴۶﴾ فِیۡ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوۡنٍ ﴿۱۴۷﴾ وَّ زُرُوۡعٍ وَّ نَخۡلٍ طَلۡعُہَا ہَضِیۡمٌ ﴿۱۴۸﴾ وَ تَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا فٰرِہِیۡنَ ﴿۱۴۹﴾ فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۵۰﴾ وَ لَا تُطِیۡعُوۡۤا اَمۡرَ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِیۡنَ یُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا یُصۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۲﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসুল । সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য কর । আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না । আমার প্রতিদান তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন । এখানে যেসব নেয়ামত আছে তোমাদেরকে কি তার ভেতর সর্বদা নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে ? উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ সমূহের ভেতর ? এবং ক্ষেত-খামার ও এমন খেজুর বাগানের ভেতর যার গুচ্ছ পরস্পর স্বর নিবিষ্ট তোমরা কি (সর্বদা) জাঁকজমকের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতে থাকবে ? এবার আল্লাহকে ভয় করো ও আমাকে মেনে চলো । সীমালংঘনকারীদের কথামতো চলোনা । যারা জমিনে অশান্তি বিস্তার করে এবং সংশোধন মূলক কাজ করে না ।" (সূরা শুআরা: ১৪৩-১৫২)

✎ "নাকতুল্লাহ্"এর হত্যা...

সামুদ সম্প্রদায় প্রতিবার সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও তিনি যখন তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন,তখন তারা ভাবল সালেহ্ আ: কে তার বাণী প্রচার থেকে নিবৃত্ত করতে হবে । তারা বলল, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু করে দেখাতে পারবে । অর্থাৎ তারা সালেহ্ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে কোনো মুজিযা বা নিদর্শন চাচ্ছিল । এখানে উল্লেখ্য, কোন জাতির মধ্যে নবী বা রাসূল প্রেরণের পর তাদের দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও যদি তারা ঈমান না আনে এবং

তারা তাদের নবী বা রাসূলের নিকট কোন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের দাবি করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কেবল একটি শর্তে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেন । আর তা হল, যদি তারা সেই নিদর্শন দেখার পরেও আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনে এবং তাঁর আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেন । অতঃপর তারা সালেহ আলাইহিস সালাম কে বলল, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকো তাহলে ওই পাহাড় থেকে একটি জীবন্ত উটনী বের করে আনো এবং উটনীটি এতো বিরাট হতে হবে যা আমরা আগে কখনো দেখিনি । শুধু তাই নয়, উটনীটি কে হতে হবে গর্ভবতী ।

তারা ভাবল এবার হয়তো সালেহ্ আ: দমে যাবেন । কিন্তু এমনটি হলো না । এরপর হযরত সালেহ্ আ: তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, যদি তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়, তবে কি তোমরা আমার নবুঅতের প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে ? জেনে রেখ, উক্ত মু‘জেযা প্রদর্শনের পরেও যদি তোমরা ঈমান না আনো, তাহলে আল্লাহর গযবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে । এতে সবাই স্বীকৃত হ’ল ও উক্ত মর্মে অঙ্গীকার করল। তখন সালেহ্ (আঃ) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর নিকটে দুআ করে সামুদ এর লোকদের বর্ণিত সেই অলৌকিক নিদর্শন চাইলেন । আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন, “আমি তাদের পরীক্ষার্থে তাদের কাছে একটি উট পাঠাচ্ছি । সুতরাং তুমি তাদেরকে দেখতে থাকো এবং সবর অবলম্বন কর ।”(সূরা ক্বামার:২৭)
অতঃপর পাহাড়ের একটি বিরাট অংশ কাঁপতে শুরু করল । তারা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, পাহাড়ের এক বিশাল অংশ কাঁপতে কাঁপতে বিস্ফোরিত হয়ে একটি গর্ভবতী উটনী বেরিয়ে এলো । সেটি দেখতে এতটাই প্রকাণ্ড ছিল যে এর আগে কখনো কেউ এমন দেখেনি । সেই উট টিকে আল্লাহ্ “নাকতুল্লাহ” বা আল্লাহর উট বলে পবিত্র কুরআনে সম্বোধন করেছেন । সালেহ্ আ: বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহর এক উটনী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনরূপে এসেছে । সুতরাং এটিকে আল্লাহর ভূমিতে স্বাধীনভাবে চড়ে খেতে দাও। একে অসদুদ্দেশ্যে স্পর্শও করবে না । অন্যথায় এক মহা দিবসের শাস্তি তোমাদের কে পাকড়াও করবে । আল্লাহ সেই উষ্ট্রীর জন্য এবং লোকদের জন্য পানি বন্টন করে দিয়েছিলেন। তাদের শহরে যে কুয়াটি ছিল আল্লাহ তায়ালা আদেশ করলেন, একদিন সেখান থেকে নাকতুল্লাহকে পানি পান করবে এবং অপরদিন তোমরা পান করবে । তবে যেদিন নাকতুল্লাহ পানি পান করবে সেদিন আর অন্য কেউ সে কুয়া থেকে পানি নিতে পারবে না । যেহেতু নাকুতুল্লাহ ছিল বিশাল আকৃতির তাই সে যেদিন সেখান থেকে পানি পান করত সেদিন সেই কুয়ার সকল পানি শেষ হয়ে যেত । তারপরের দিন শহরের লোকেরা কোন পানি পেত না । একপর্যায়ে তারা বিরক্ত হয়ে পড়ল । এসব নিয়মকানুন মেনে চলা তাদের জন্য বোঝা মনে হতে লাগলো

। নাকতুল্লাহর উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে সামুদের লোকেরা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা তাকে হত্যা করবে । অবশেষে তারা উটনীটির পায়ের রগ কেটে তাকে হত্যা করলো।

✐ কওমে সামুদের ওপর আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত আযাব...

সালেহ আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা যখন নাকতুল্লাহ কে হত্যা করল, তখন সালেহ্ আ: তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তোমরা তিন দিন নিজেদের ঘরবাড়িতে ফুর্তি করে নাও । অর্থাৎ এখন শাস্তি আসতে মাত্র তিন দিন বাকি আছে । অতঃপর তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে ।(সূরা হুদ-৬৫) তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এই তিন দিনের প্রতিদিন তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হতে থাকবে । প্রথম দিন চেহারার রং হবে হলুদ, দ্বিতীয় দিন লাল এবং তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে । এসব শুনেও সামুদের লোকেরা তাওবা ইস্তেগফারে রত হলো না বরং তারা হযরত সালেহ আ: ও তার পরিবারবর্গ কেই হত্যা করার ষড়যন্ত্র আটল, যা সূরা নামলে বর্ণিত হয়েছে -

وَ كَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿۴۸﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۴۹﴾

“এবং নগরে নয় জন লোক ছিল এমন, যারা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াতো ইসলাহের কাজ করত না । তারা (একত্র হয়ে একে অন্যকে) বলল, সকলে শপথ করো, আমরা রাতের বেলা সালেহ্ ও তার পরিবারবর্গের উপর হামলা চালাবো তারপর তার ওয়ারিশকে বলবো আমরা তার পরিবার বর্গের হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত ছিলাম না বিশ্বাস করো আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী ।”

এই ৯ জন ছিল সামুদ জাতির স্বতন্ত্র এক একটি দলের নেতা । তারাই আল্লাহ পাকের পবিত্র নিদর্শন ‘নাকতুল্লাহ’কে হত্যা করেছিল । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এই চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিলেন । তবে কিভাবে তাদের এ চক্রান্ত ব্যর্থ করা হয়েছিল এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে কোন বিবরণ নেই ।

আযাব আসার পূর্বেই সালেহ্ আ: তাঁর অনুসারীদের নিয়ে হিজর ত্যাগ করলেন । অন্যদিকে তিনি যেমন বলেছিলেন, সেভাবেই সামুদের লোকদের মুখ প্রথম দিন হলুদ, দ্বিতীয় দিন লাল এবং তৃতীয় দিন একেবারে কালো হয়ে গেল । তখন তারা বুঝতে পারল এখন আল্লাহর অভিশাপ অনিবার্য । এভাবে তিন দিন কেটে গেলে

চতুর্থ দিনে এক বিরাট ভূমিকম্প আরম্ভ হল । যা তাদের বহু পরিশ্রমে তৈরি করা অট্টালিকার শহরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল । তারা তাদের ঘরবাড়িতে এমন অবস্থায় পড়ে রইল যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করেনি । এভাবে তাদের গোটা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল । ধ্বংস হওয়া এই সম্প্রদায়ের অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন এভাবে,

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

আমি তাদের উপর পাঠালাম একটিমাত্র মহানাদ । ফলে তারা হয়ে গেল খোয়ার প্রস্তুতকারীর শুষ্ক-বিচূর্ণ কাঁটার মত ।

✍ সালেহ্ আ: এর মর্যাদা এবং তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

সালেহ্ আলাইহিস সালাম একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ছিলেন যিনি আল্লাহর আদেশ পালন করতেন এবং জনগণকে সঠিক পথে আনতে কাজ করতেন। আল্লাহ তাঁকে শক্তিশালী ও বিত্তশালী সামুদ জাতির কাছে প্রেরণ করেন। তাঁর জীবনে ধৈর্য, সহনশীলতা ও আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ছিল, যা তাঁকে একজন আদর্শ নবী হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছে। আল্লাহ তাঁকে একটি অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে একটি বিশেষ উট উপহার দেন, যা সামুদ জাতির জন্য পরীক্ষাস্বরূপ ছিল।

তাঁর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি দাওয়াতের কাজে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর ভরসা কতটা জরুরি। সামুদ জাতির ধ্বংস থেকে অহংকার এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার পরিণতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা দেখতে পাই ।

☞ রেফারেন্স:

১. তারীখুল আম্বিয়া ১/৪৯ পৃ:

২. বুখারী হা/৪৩৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ।

৩. যথাক্রমে: (১) সূরা আ‘রাফ ৭/৭৩-৭৯ (২) তওবা ৯/৭০ (৩) হূদ ১১/৬১-৬৮, ৮৯ (৪) ইবরাহীম ১৪/৯ (৫) হিজর ১৫/৮০-৮৪ (৬) ইসরা ১৭/৫৯ (৭) হজ্জ ২২/৪২ (৮) ফুরক্বান ২৫/৩৮-৩৯ (৯) শো‘আরা ২৬/১৪১-১৫৯ (১০) নামল ২৭/৪৫-৫৩ (১১) আনকাবূত ২৯/৩৮ (১২) ছোয়াদ ৩৮/১৩ (১৩) গাফের/মুমিন ৪০/৩১-৩৩ (১৪) ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৩, ১৭-১৮ (১৫) ক্বাফ ৫০/১২ (১৬) যারিয়াত ৫১/৪৩-৪৫ (১৭) নাজম ৫৩/৫১ (১৮) ক্বামার ৫৪/২৩-৩১ (১৯)

আল-হা-ক্কক্বাহ ৬৯/৪-৫ (২০) বুরূজ ৮৫/১৮ (২১) ফাজ্র ৮৯/৯ (২২) শাম্স ৯১/১১-১৫। সর্বমোট ৮৭।

হযরত ইব্রাহিম আ:

✐ ইব্রাহিম আ: এর পরিচয়...

হযরত ইব্রাহিম আ: কে বলা হয় “আবুল আম্বিয়া” অর্থাৎ নবীদের পিতা । তিনি ছিলেন “খলিলুল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ঘনিষ্ঠ বন্ধু । তিনি ছিলেন ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি, যিনি ইসলাম খ্রিস্টান ও ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত । তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির পিতা । যার বংশধরদের মধ্য হতে আল্লাহ বেছে নিয়েছেন বহু নবী-রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ সা: । ইব্রাহিম আ: ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছিলেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন ।

বিভিন্ন স্কলারদের মতে, ইব্রাহিম আ: এর জন্ম প্রাচীন বাবেল বা ব্যাবিলন শহরের উর পাহাড়ের অঞ্চলে যা বর্তমানে ইরাকের হিল্লা শহরে অবস্থিত । আত্ তাবারির বর্ণনা অনুযায়ী, ইব্রাহিম আলাই সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম এর মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ছিল প্রায় দুই হাজার বছরের । ইবনে কাসির রহি: তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জুমহুর উলামাদের মতে, তাঁর পিতার নাম ছিল তারেহ্ । আহলে কিতাবগন বলত “তারেখ” । তার আরো একটি নাম যা পবিত্র কুরআনে এসেছে সেটি হলো “আজার” । আজার ছিল মেসোপটেমিয়ার রাজ্যের এক প্রখ্যাত পুরোহিত । সে ছিল মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত । বলা হয়, তাদের একটি দেবতার নাম ছিল আজার এবং সে সেই দেবতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিল বিধায় মানুষ তাকে আজার বলে ডাকত।

ইব্রাহিম আ: তাঁর জীবনের এক পর্যায়ে বাবেল থেকে কেন’আনে হিজরত করেন ।সেখান থেকে বিবি সারা-র বংশজাত নবীগণের মাধ্যমে আশপাশে সর্বত্র তাওহীদের দাওয়াত বিস্তার লাভ করে। অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশ এলাকায় তাওহীদের প্রচার ও প্রসার হয় এবং অবশেষে এখানেই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সা:-এর আগমন ঘটে। এভাবে ইবরাহীমের দুই স্ত্রীর বংশজাত নবীগণ বিশ্বকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেন। শেষনবী মুহাম্মদ সা: এর জীবনী থেকে আমরা দেখতে পাই, তাঁকে যখন মে’রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা আসমান সমূহে ভ্রমণ করান তখন সপ্তম আসমানে ইব্রাহীম আ: এর সাথে তাঁর দেখা হয় । মে’রাজ থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর উম্মতদেরকে বলেন, অতঃপর আমাকে সপ্তম আকাশে আরোহন করালেন । সেখানে দেখলাম, বাইতুল মামুর এর দরজার কাছে এক বৃদ্ধ বসে আছেন । তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ মুহাম্মদ সা: তার সাথে সবচেয়ে

বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম,“হে জিব্রাইল! ইনি কে?” তিনি বললেন, “তিনি আপনার পিতা ইব্রাহিম আ: ।” **(১)**

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৫টি সূরায় ২০৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। **(২)**

✍ নবুওয়াত প্রাপ্তি ও নিজ কওমের প্রতি দাওয়াত...

ইব্রাহিম আ: এর সময়ে তাঁর কওমের লোকেরা বিভিন্ন মূর্তিপূজা এবং নক্ষত্রপূজা করত । তাঁর পিতা যেহেতু তার কওমের বিখ্যাত পুরোহিত ছিল তাই তিনি চাইলে আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন । কিন্তু তিনি সেই পথ বেছে নেননি । তিনি জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগলেন এবং সামাজিক প্রথাগুলো অর্থাৎ মূর্তিপূজা নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন । এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে এবং নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে একসময় তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হয়। ইব্রাহিম আ: নবুওয়াত লাভ করেন । নবুওয়াত লাভের পর ইব্রাহিম আলাই সালাম তার কওমের লোকদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানালেন । আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এ সম্পর্কে বলেছেন,

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-(العنكبوت-(১৭-১৬

‘স্মরণ কর ইবরাহীমকে, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ’। ‘তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর নিকটে রিযিক তালাশ কর। তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ (সূরা আনকাবূত ৩৩:১৬-১৭)।

ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, ‘এই মূর্তিগুলি কী যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ’? ‘তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পূজা করতে দেখেছি’। ‘সে বলল, তোমরা প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও’। ‘তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ এসেছ, না কেবল কৌতুক করছ’? ‘সে বলল, না। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে তোমাদের উপর অন্যতম সাক্ষ্যদাতা’। ‘আল্লাহর কসম! যখন তোমরা

ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কিছু করে ফেলব' (আম্বিয়া ২১/৫২-৫৭)।

এরপরও তাঁর কওম তাঁর আহ্বান এর প্রতি একটুও কর্ণপাত করল না । বরং তারা তাকে নিয়ে উপহাস করতে লাগলো এবং আরো অধিক অবাধ্যতা ও নাফরমানি করতে লাগলো । আল্লাহ বলেন, আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম, যাতে সে দৃঢ়বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়'। 'অনন্তর যখন রাত্রির অন্ধকার তার উপরে সমাচ্ছন্ন হ'ল, তখন সে তারকা দেখে বলল যে, এটি আমার পালনকর্তা। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল, আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না'। 'অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, তখন সে বলল, এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু পরে যখন তা অস্তমিত হ'ল, তখন বলল, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। 'অতঃপর যখন উদীয়মান সূর্যকে ডগমগে দেখতে পেল, তখন বলল, এটিই আমার পালনকর্তা এবং এটিই সবচেয়ে বড়। কিন্তু পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত'। 'আমি আমার চেহারাকে ঐ সত্তার দিকে একনিষ্ঠ করছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই'। '(তখন) তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্ক করল। সে বলল, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে সরল পথ দেখিয়েছেন। আর আমি ভয় করিনা তাদের, যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক কর, তবে আমার পালনকর্তা যদি কিছু (কষ্ট দিতে) চান। আমার প্রভুর জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যপ্ত। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না'? কিভাবে আমি ঐসব বস্তুকে ভয় করব, যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করেছ? অথচ তোমরা এ বিষয়ে ভয় পাওনা যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করেছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। এক্ষণে উভয় দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক'। 'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' । (আন'আম ৬:৭৫-৮২)

অর্থাৎ তিনি তাদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে এই পন্থা অবলম্বন করলেন যে, তিনি চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র কে দেখে প্রথমে নিজ কওমের ভাষায় কথা বললেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, তোমাদের ধারণায় তো এসব নক্ষত্র আমার রব তবে এসো আমরা খতিয়ে দেখি এ ধারণা মেনে নেওয়ার উপযুক্ত কিনা । সুতরাং যখন নক্ষত্র ও চন্দ্র ডুবে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সূর্যও, তখন প্রত্যেকবার তিনি নিজ কওমকে স্মরণ করালেন যে, এসব তো অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল

জিনিস। যে জিনিস নিজেই অস্থায়ী, আবার যাতে ক্রমাগত পরিবর্তনও ঘটতে থাকে সে সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষন করা যে, সে নিখিল বিশ্বকে প্রতিপালন করে এটা কতই না অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কথা ।

✍ নিজ পিতার প্রতি ইব্রাহিম আ: এর দাওয়াত...

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقاً نَّبِيًّا، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً، يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً، يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً، يَا أَبَتِ إِنِّيْ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّا ً

'তুমি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী'। 'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! তুমি তার পূজা কেন কর, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না? 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব'।'হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য'। 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে'। (সূরা মারিয়াম ৪১-৪৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- (الأنعام ٧٤)

'স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ' । (সূরা আন'আম ৭৪)

কিন্তু ইবরাহীমের এই প্রাণভরা আবেদন পিতা আযরের হৃদয় স্পর্শ করল না। রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত এবং সম্রাটের মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র হওয়ায় সম্ভবত: বিষয়টি তার প্রেস্টিজ ইস্যু হয়। সে তখন বলল, হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি পাথরে আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে

দূর হয়ে যাও। ইব্রাহিম আ: বললেন, তোমার প্রতি সালাম । আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব । তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের হতে ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি । আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি । আশা করি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থ হব না । (সূরা মারিয়াম: ৪৬-৪৮)

অতঃপর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন । তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিলেন, আমার পিতা কে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই তিনি পথভ্রষ্টদের একজন । (সূরা শুআরা:৮৬) কিন্তু যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা এলো এবং তিনি জানতে পারলেন যে, তার মৃত্যু কুফর অবস্থায়ই হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে আল্লাহর শত্রু হয়ে থাকবে তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ত্যাগ করলেন ।

ইব্রাহিম আ: এর সাথে যখন তারা যুক্তি ও বিতর্কে পেরে উঠতে পারল না, তখন তারা বিতর্কের পথে এড়িয়ে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথ অবলম্বন করল যাতে তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা টিকিয়ে রাখতে পারে। তারা বলল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও। এবং নিজেদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর যদি তোমাদের কিছু করার থাকে। অতঃপর একটা ভিত নির্মাণ করা হল এবং সেখানে বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করা হল। তারপর সেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হল (সূরা সাফফাত ৩৭:৯৭)। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের সময় ইব্রাহীম আ: বলে ওঠেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'।(৩)

✍ মূর্তি ভাঙার ঘটনা...

মানুষ যখন কোন কিছুর প্রতি অন্ধভক্তি পোষণ করে, তখন শত যুক্তিও কোন কাজ দেয় না। এবার ইবরাহীম আ: ভাবলেন, এমন কিছু একটা করা দরকার, যাতে পুরা সমাজ নড়ে ওঠে ও ওদের মধ্যে হুঁশ ফিরে আসে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে তাওহীদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেমতে তিনি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় দেবমন্দিরে গিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার সংকল্প করলেন।

ইবরাহীম আ:-এর সম্প্রদায় বছরের একটা বিশেষ দিনে উৎসব পালন করত ও সেখানে নানারূপ অপচয় ও অশোভন কাজ করত। কওমের লোকেরা তাকে উক্ত মেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ

করলেন (সূরা ছাফফাত ৩৭:৮৯) । অতঃপর তিনি ভাবলেন, আজকের এই সুযোগে আমি ওদের মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে ওরা ফিরে এসে ওদের মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য দেখতে পায়। হয়তবা এতে তাদের অনেকের মধ্যে হুঁশ ফিরবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান জাগ্রত হবে ও শিরক থেকে তওবা করবে।
অতঃপর তিনি দেবালয়ে ঢুকে পড়লেন ও দেব-দেবীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, (তোমাদের সামনে এত নযর-নেয়ায ও ভোগ-নৈবেদ্য রয়েছে)। অথচ 'তোমরা তা খাচ্ছ না কেন? কি ব্যাপার, তোমরা কথা বলছ না কেন? তারপর তিনি ডান হাতে রাখা (সম্ভবতঃ কুড়াল দিয়ে) ভীষণ জোরে আঘাত করে সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিলেন (সূরা সাফফাত ৩৭:৯১-৯৩)। তবে বড় মূর্তিটাকে পূর্বাবস্থায় রেখে দিলেন, যাতে লোকেরা তার কাছে ফিরে যায় (আম্বিয়া ২১:৫৮) ।

মেলা শেষে লোকজন ফিরে এল এবং যথারীতি দেবমন্দিরে গিয়ে প্রতিমাগুলির অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। 'তারা বলাবলি করতে লাগল, এটা নিশ্চয়ই ইবরাহীমের কাজ হবে। কেননা তাকেই আমরা সবসময় মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বলতে শুনি। অতঃপর ইবরাহীমকে সেখানে ডেকে আনা হ'ল এবং জিজ্ঞেস করল, أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيم؟ 'হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছ'? (সূরা আম্বিয়া ২১:৬২)।

ইবরাহীম বললেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُوْن- 'বরং এই বড় মূর্তিটাই একাজ করেছে। নইলে এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে' (সূরা আম্বিয়া ২১:৬৩)। সম্প্রদায়ের নেতারা একথা শুনে লজ্জা পেল এবং মাথা নীচু করে বলল, قَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَء يَنْطِقُوْن- 'তুমি তো জানো যে, এরা কথা বলে না'। 'তিনি বললেন, قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَّلاَ يَضُرُّكُم- 'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না' (সূরা আম্বিয়া ২১:৬৫-৬৬)। তিনি আরও বললেন, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون- 'তোমরা এমন বস্তুর পূজা কর, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর'? 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন' (সূরা সাফফাত ৩৭:৯৫-৯৬)। أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُون- 'ধিক তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর, ওদের জন্য। তোমরা কি বুঝ না'? (সূরা আম্বিয়া ২১:৬৭)।

ইব্রাহিম আ: এর সাথে যখন তারা যুক্তি ও বিতর্কে পেরে উঠতে পারল না, তখন তারা বিতর্কের পথে এড়িয়ে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথ অবলম্বন করল যাতে তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা টিকিয়ে রাখতে পারে। তারা বলল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও। এবং নিজেদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর যদি তোমাদের কিছু করার থাকে। অতঃপর একটা ভিত

নির্মাণ করা হল এবং সেখানে বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করা হল। তারপর সেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হল (সূরা সাফফাত ৩৭:৯৭)। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের সময় ইব্রাহীম আ: বলে ওঠেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক’।(৩) এ মূহুর্তে, আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের মহিমা প্রকাশ করলেন । তিনি বললেন, হে আগুন! ঠান্ডা হয়ে যাও এবং ইব্রাহিম এর পক্ষে শান্তিদায়ক হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া: ৭১) তখন আগুন তাঁর জন্য ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে গেল। অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইবরাহীম (আঃ) ফিরে এলেন এবং এভাবে আল্লাহ কাফিরদের সমস্ত কৌশল বরবাদ করে দেন। এরপর শুরু হল তাঁর জীবনের আরেকটি অধ্যায়।

ইব্রাহিম আ: এর হিজরত...

ইব্রাহীম আ: এর মূল নিবাস ছিল ইরাকে। অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী সারা ও ভ্রাতৃপুত্র লূতকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশ শাম বা সিরিয়ার অন্তর্গত কেন‘আন নামক স্থানে, যা এখন তাঁর নামানুসারে ‘খালীল’ (الخليل) নামে পরিচিত হয়েছে। কেননা তাঁরা ছাড়া তাঁর মাতৃভূমিতে আর কেউ ঈমান আনেনি । পরবর্তীকালে তার ভাতৃপুত্র লূত কেও আল্লাহ তা'আলা নবী বানান । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, অতঃপর লূত তার প্রতি ঈমান আনলো । ইব্রাহিম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি নিশ্চয়ই তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।(সূরা আনকাবুত: ২৬)
হিজরতের পর তাঁরা কেন’আনে বসবাস করতে লাগলেন । জীবনের এই অধ্যায়ে এসেও তাদের নানা ধরনের পরীক্ষা সম্মুখীন হতে হয় এবং একসময় সেখানে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । ফলে বহু মানুষ শাম থেকে মিশরে ভ্রমন করতে লাগল । আল্লাহর হুকুমে সারাহ্ আ: কে নিয়ে ইব্রাহিম আ: ও মিশরের পানে যাত্রা করলেন । মিশরের ইতিহাসে একটা বড় সময় ধরে যে শাসনব্যবস্থা ছিল সেই শাসন ব্যবস্থায় শাসক কে ফিরআউন বলা হত । ফেরাউনের কাছে খবর আসলো যে সম্প্রতি একজন অত্যন্ত রূপবতী নারী মিশরে প্রবেশ করেছে এবং তারা মা সারাহ্ র কথা বলছিল । জালিম শাসক ফিরআউন এর মনে তাঁর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলো । এরপর সে তাঁকে আনার জন্য লোক পাঠালো । মিশরীয় সম্রাটের নিয়ম ছিল এই যে, যে মহিলাকে তারা অপহরণ করত, তার সাথী পুরুষ লোকটি যদি স্বামী হ’ত, তাহলে তাকে হত্যা করে মহিলাকে নিয়ে যেত। আর যদি ভাই বা পিতা হত, তাহলে তাকে ছেড়ে দিত। তাই ইব্রাহিম আ: কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সারাহ্ তাঁর কী হন তখন তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য বললেন, সে আমার বোন হয় । অতঃপর ফিরআউনের লোকেরা মা সারাহ্কে ফিরআউনের কাছে নিয়ে গেল । আর ইব্রাহিম আ: আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে

লাগলেন । ফিরআউন যখন একান্ত ভাবে মা সারাহ্কে পেল সে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো । অতঃপর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন,

فلمَّا دَخلتْ سارةُ على الْمَلِكِ قامَ إليها فأَقبلتْ تتوضأُ و تُصَليِّ وتقولُ: أللَّهم إنْ كنتَ تعلمُ أَنِّي آمنتُ بِكَ وبرسولكَ وأَحْصنتُ فَرْجِي إلا على زوجي فلا تُسلِّطْ عليَّ الكافرَ (رواه البخاريُّ و أحمد بإسنادٍ صحيحٍ)

‘যখন সারা সম্রাটের নিকটে নীত হ’লেন এবং সম্রাট তার দিকে এগিয়ে এল, তখন তিনি ওযূ করার জন্য গেলেন ও ছালাতে রত হয়ে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাক যে, আমি তোমার উপরে ও তোমার রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি এবং আমি আমার একমাত্র স্বামীর জন্য সতীত্ব বজায় রেখেছি, তাহ’লে তুমি আমার উপরে এই কাফিরকে বিজয়ী করো না’।(৪) সতীসাধ্বী স্ত্রী সারাহ্ এর দু‘আ সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে গেল। ফিরআউন এগিয়ে আসার উপক্রম করতেই হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে । তারপর সে বলে, “তুমি তোমার রবের কাছে দোয়া করো তিনি যেন আমাকে ঠিক করে দেন তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব ।” তখন মা সারাহ্ প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! লোকটি যদি এভাবে মারা যায়, তাহলে লোকেরা ভাববে আমি ওকে হত্যা করেছি। তখন আল্লাহ সেই জালিমকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবার তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে চাইল। মা সারাহ্ দ্বিতীয়বারের মতো আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য চাইলেন । এবারও সেই জালিমের হাত-পা অবশ হয়ে গেল । এভাবে তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটলো । অবশেষে সে বলল, তোমরা আমার কাছে একটা শয়তানীকে পাঠিয়েছ। যাও একে ইবরাহীমের কাছে ফেরত দিয়ে আসো । ফিরআউন তাঁকে অঢেল ধন-সম্পদ উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দিলেন । ফিরআউনের কাছ থেকে পাওয়া নানা উপহারের মধ্যে ছিল একজন দাসী যার নাম ছিল ”হাজেরা” । অতঃপর ইব্রাহিম আ: স্ত্রী সারাহ্ ও দাসী হাজেরাকে নিয়ে কেন’আনে ফিরে গেলেন ।

✎ ইসমাইল আ: এর জন্ম...

ইব্রাহিম আ: এর বয়স তখন আনুমানিক ৮৫ । স্ত্রী সারাহ্-র ও বয়স হয়েছে অনেক । কিন্তু তখনও তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান । হাজেরা ছিলেন তখনও যুবতী। তাই তিনি ইব্রাহিম আ: কে বলেন, তিনি যেন হাজেরা কে বিয়ে করেন । অবশেষে তিনি স্ত্রী সারাহ্ র প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং হাজেরাকে বিয়ে করলেন । কিছুকাল পরই আল্লাহর বিশেষ রহমতে মা হাজেরা গর্ভবতী হলেন এবং ইব্রাহিম আ: এর প্রথম সন্তান ইসমাইল আ: জন্মগ্রহণ করলেন । এ সময় তাঁর

বয়স ছিল ৮৬ বছর । নিঃসন্তান পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুষ্ক মরুতে যেন প্রাণের জোয়ার এলো। বস্তুত: ইসমাঈল ছিলেন নিঃসন্তান ইবরাহীমের দু'আর ফসল। কেননা তিনি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নিকটে 'নেককার সন্তান' কামনা করেছিলেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ - '(ইবরাহীম বললেন,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দাও। অতঃপর আমরা তাকে একটি ধৈর্য্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।'(সূরা সাফফাত ৩৭: ১০০-১০১)

শিশুপুত্র ইসমাইল ও মা হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন...

শিশু বয়সেই ইসমাঈল আ: ও তাঁর মা হাজেরা কে আল্লাহর নির্দেশে জনমানবহীন এক ধূ-ধূ মরুভূমিতে রেখে আসেন পিতা ইব্রাহিম আ: । সেখানে কোনরূপ পানির ব্যবস্থাও ছিল না । আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি শিশু ইসমাঈল ও মা হাজেরাকে কর্কশ সেই মরুভূমির মাঝে রেখে কোনো কথা না বলে ফিরে যেতে লাগলেন । তাকে ফিরে যেতে দেখে মা হাজেরা বললেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি আমাদের এই উপত্যকা ভূমিতে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন?" তাঁর কথা শুনে ইব্রাহিম আ: নিরুত্তর রইলেন । অবশেষে হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহই কি আপনাকে আমাদের এখানে রেখে যাওয়ার আদেশ করেছেন ? ইব্রাহিম আ: এবার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাকের আদেশেই ।" হাজেরা এটা শুনে বললেন, "যদি এটা আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই । তিনি আমাদের ধ্বংস ও বিনষ্ট করবেন না ।" ইব্রাহিম আ: তাঁদের কাছে একটি থলের মধ্যে অল্পকিছু খেজুর আর একটি মাশকে অল্পপরিমাণ পানি রেখে ফিরে এলেন । তাঁরা যখন তাঁর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই দুআ করলেন,

رَبَّنَآ اِنِّیۡٓ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡ زُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ ﴿۳۷﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের আশপাশে এমন এক উপত্যকায় এনে বসবাস করিয়েছি, যেখানে কোন ক্ষেত-খামার নেই । হে আমাদের প্রতিপালক! (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা নামাজ কায়েম করে । সুতরাং, মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ।"(সূরা ইব্রাহিম: ৩৭)

হাজেরা কয়েকদিন পর্যন্ত সেই খেজুর খান এবং মশক থেকে পানি পান করেন । সেই সাথে শিশু ইসমাঈলকে দুধ পান করাতে থাকেন । কয়েক দিনের মধ্যেই সব খাবার এবং পানি শেষ হয়ে গেল । ফলে তিনি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন এবং শিশু ইসমাঈল ও তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল । শিশু ইসমাঈল একপর্যায়ে ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় ছটফট করতে লাগলো । মা হাজেরা কোনো উপায়ান্তর না দেখে নিকটস্থ সাফা পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন । যদি কোন আল্লাহর বান্দার দেখা মেলে, যদি কোন পানির সন্ধান পাওয়া যায় । কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। এরপর তিনি নিকটস্থ মারওয়া পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন । এবারও তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না । এভাবে তিনি ৭ বার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করলেন । কিন্তু কারো দেখা মিলল না । ইবনু ‘আব্বাস রা: বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এজন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে । এবার আল্লাহ তায়ালার হুকুমে স্বয়ং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে হাজির হলেন । তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে এমন ভাবে আঘাত করলেন যে, সেখান থেকে অঝোরে পানি বের হতে লাগলো এবং এমনভাবে পানি বের হতে লাগল যেন গোটা উপত্যকাই পানিতে ভরে যাবে । মা হাজেরা তখন সেখানে মাটি উঁচু করে সেখানে কুয়ার মতো বানিয়ে দিলেন। কিন্তু তবুও পানি উপচে পড়তে লাগল । হাজেরা সেখান থেকে পানি পান করলেন । এরপর শিশু পুত্র ইসমাঈলকে দুধ পান করালেন । অলৌকিক সেই কূপটিকেই বলা হয় “জমজম” । তখন জিবরাঈল আ: তাঁকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনঃ নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তার পরিজনকে কখনও ধ্বংস করবেন না ।

অলৌকিক জমজমের পানি দেখা দেওয়ার পর সে অঞ্চলে পাখিরা ঘোরাফেরা করা শুরু করলো । কিছুদিন পর জুরহুম গোত্রের এক ব্যবসায়ী কাফেলা সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল । তারা দেখল অনতিদূরেই পাখি উড়ছে । তারা ভাবল নিশ্চয়ই সেখানে পানি রয়েছে । মরুভূমির মাঝখানে এত পাখির কোলাহল দেখে তারা কৌতুহল নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল । তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। ইসমাঈল আ:-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা

সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদেরও সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাজেরা আ: ইন্তিকাল করেন।

✍ কুরবানির ঘটনা...

একমাত্র শিশু পুত্র ও তার মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইব্রাহিম আ: মাঝে-মধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা-শুনা করতেন। এভাবে ইসমাইল যখন চলাফেরা করার উপযুক্ত হলেন তখন তিনি আরো একবার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন । জীবনের এই পর্যায়ে এসে ইব্রাহিম আ: তার আদরের পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং বারবার একই স্বপ্ন দেখার ফলে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন । তিনি বুঝতে পারলেন তিনি যা স্বপ্নে দেখেছেন তা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি একটি আদেশ । তখন তিনি তাঁর পুত্র ইসমাইলকে বললেন, পাছা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি । এবার চিন্তা করে বল, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী ? ছোট্ট ইসমাইল আ: বললেন, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন । ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন । (সূরা সাফ্ফাত:১০২)

অতঃপর নিজের মনকে শক্ত করে ইব্রাহিম আ: তাঁর প্রিয় সন্তানকে নিয়ে হেঁটে চললেন তাকে কুরবানী করার জন্য । এরকম নাজুক মুহূর্তে শয়তান এসে তার সামনে হাজির হয় । মানুষের রূপ নিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে । তিনি তখন শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ করেন। তিনবার শয়তান তার সামনে হাজির হয় । তিন বারই তিনি তাকে পাথর মেরে সরিয়ে দেন । অবশেষে ইসমাইল আ: মাথা নিচু করে কুরবানি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান । ইব্রাহিম আ: আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজ সন্তানকে কুরবানি করার জন্য ছুরি তুলে ধরলেন এবং সেই মুহূর্তে আল্লাহর ওহী নাযিল হয় । "সুতরাং যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল । আর আমি তাঁকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইব্রাহিম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছো । নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি । নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা । আল্লাহর হুকুমে শেষ মুহূর্তে

ইসমাইল আ: এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে যায় । ইসমাইল আ: জীবিত ও নিরাপদ থাকলেন ।

✍ ইসহাক জন্মের সুসংবাদ...

পুত্র কুরবানীর ঘটনার পরে ইব্রাহিম আ: কেন‘আনে ফিরে এলেন। এসময় বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহ্-র গর্ভে ভবিষ্যৎ সন্তান ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতাদের শুভাগমন ঘটে। ইবনু আববাস রাঃ বলেন, উক্ত ফেরেশতাগণ ছিলেন হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল। তারা মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বক্তব্য নিম্নরূপ:

‘আর আমাদের প্রেরিত সংবাদবাহকগণ (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) ইবরাহীমের নিকটে সুসংবাদ নিয়ে এল এবং বলল, সালাম। সেও বলল, সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একটা ভূণা করা বাছুর এনে (তাদের সম্মুখে) পেশ করল

। কিন্তু সে যখন দেখল যে, মেহমানদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে সন্দেহে পড়ে গেল ও মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল (কারণ এটা তখনকার যুগের খুনীদের নীতি ছিল যে, যাকে তারা খুন করতো, তার বাড়ীতে তারা খেত না)। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা আপনাকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও লূত্বের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তার স্ত্রী (সারা) নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। আমরা তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে (তার পুত্র) ইয়াকূবেরও। সে বলল, হায় কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এতো ভারী আশ্চর্য কথা! তারা বলল, আপনি আল্লাহর নির্দেশের বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছেন? হে গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপরে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত ও মহিমময়’ (সূরা হূদ ১১:৬৯-৭৩)। একই ঘটনা আলোচিত হয়েছে সূরা হিজর ৫২-৫৬ ও সূরা যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াত সমূহে।
উল্লেখ্য যে, অধিক মেহমানদারীর জন্য ইবরাহীমকে ‘আবুয যায়ফান’ (ابو الضيفان) বা মেহমানদের পিতা বলা হ’ত।

✍ মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষকরণ...

বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহর বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের মাধ্যমে আল্লাহ যেভাবে তাদের ঈমান বর্ধিত ও মযবূত করেছিলেন। সম্ভবত: তাতে উৎসাহিত হয়ে ইবরাহীম (আঃ) একদিন আল্লাহর কাছে দাবী করে বসলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, তা আমাকে একটু দেখান, যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- (البقرة-২৬০)

‘আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি (ক্বিয়ামতের দিন) মৃতকে জীবিত করবে। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? (ইবরাহীম) বলল, অবশ্যই করি। কিন্তু দেখতে চাই কেবল এজন্য, যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহ’লে চারটি পাখি ধরে নাও এবং সেগুলিকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোকে (যবেহ করে) সেগুলির দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে রেখে আস। তারপর সেগুলিকে ডাক দাও। (দেখবে) তোমার দিকে দৌড়ে চলে আসবে (উড়তে উড়তে নয়। কেননা তাতে অন্যান্য পাখির সাথে মিশে গিয়ে তোমার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে যে, সেই চারটি পাখি কোন কোনটি)। জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়’ (সূরা বাক্বারাহ ২:২৬০)।

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ মুশরিক ও নাস্তিক সমাজকে দেখিয়ে দিলেন যে, কিভাবে মাটিতে মিশে যাওয়া মৃত মানুষকে তিনি ক্বিয়ামতের দিন পুনর্জীবন দান করবেন।

✍ পবিত্র কা’বা গৃহ নির্মাণ...

ইব্রাহিম আ: এর উপর আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন । তিনি তাকে এমন এক ঘর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন যেখানে শুধু এক আল্লাহর ইবাদত হবে । একটি মত অনুযায়ী, কাবা নির্মাণের আগে সেখানে ফেরেশতারা আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং আদম আ: সেখানে প্রথমে কাবা নির্মাণ করেন । তারপর নূহ আ: এর তূফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইব্রাহিম আ: তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ইবনে কাসির এর মতে আরো শক্তিশালী ব্যাখ্যা হল, আলী রা:

এর মত, তিনি বলেন, ইব্রাহিম আ:-ই প্রথম কা'বা নির্মাণ করেন । আল্লাহর হুকুম পেয়ে ইব্রাহিম আ: কেন'আন ছেড়ে মক্কা চলে যান । ইসমাইল তখন বড় হয়েছেন । সেখানে গিয়ে তিনি ছেলে ইসমাইলকে কা'বা গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা জানালেন । তিনি তাঁর বাবার সাথে সানন্দে নির্মাণ কাজ যোগ দিলেন । একটি জান্নাতি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম আ: কাবা গৃহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন । যেটি তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাআপনি উপরে-নিচে ওঠানামা করতো । সেই পাথরের উপর দাঁড়াতে দাঁড়াতে সেখানে তাঁর পায়ের ছাপ পড়ে যায় । সেই ছাপ হাজার হাজার বছর পর আজও অবশিষ্ট রয়েছে এবং সেই পাথরটিকেই বলা হয় "মাকামে ইব্রাহিম" ।

পবিত্র কাবা গৃহ নির্মাণ শেষে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আ: কে হজ স্থাপনের ঘোষণা দিতে বললেন । আল্লাহ বলেন,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ- (الحج-(٢٨-٢٧

'আর তুমি মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা জারি করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দীর্ঘ সফরের কারণে) সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং (কুরবানীর) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে (১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ) তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ পশু সমূহ যবেহ করার সময় তাদের উপরে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও অভাবী ও দুস্থদেরকে (হজ্জ ২২:২৭-২৮)।

ইব্রাহিম আ: একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠে দাঁড়িয়ে হজের আহ্বান জানান । সেই থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হজ করতে আসেন এবং উচ্চস্বরে ধ্বনি তুলে আল্লাহর কাছে ঘোষণা দিয়ে বলেন, "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির । কা'বা গৃহ নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, তা যেমন ছিল অন্তরভেদী, তেমনি ছিল সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক। তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ- (البقرة ١٢٩-١٢٧)-

“হে প্রভু! তুমি আমাদের (এই খিদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ । হে প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহে পরিণত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকেও তোমার প্রতি একটা অনুগত দল সৃষ্টি কর। তুমি আমাদেরকে হজ্জের নীতি-নিয়ম শিখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান । হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এদের মধ্য থেকেই এদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে এসে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও দূরদৃষ্টিময় (সূরা বাক্বারাহ ২:১২৭-১২৯)।”

ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ: এর উপরোক্ত দু‘আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। তাঁদের পরের প্রায় সকল নবী তাঁদের বংশধর ছিলেন। কা‘বার খাদেম হিসাবেও চিরকাল তাদের বংশের একদল দ্বীনদার লোক সর্বদা নিয়োজিত ছিল। কা‘বার খেদমতের কারণেই তাদের সম্মান ও মর্যাদা সারা আরবে এমনকি আরবের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। ইবরাহীমের দু‘আর ফসল হিসাবেই মক্কায় আগমন করেন বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ সা: ।

✍ ইব্রাহিম আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবন থেকে শিক্ষণীয়...

ইব্রাহিম আ: প্রায় ২০০ বছরের দীর্ঘ জীবন যাপন করেন । তোর পুরোটা জীবনের পরতে পরতে যেমন পরীক্ষা ছিল তেমনি ছিল আল্লাহর অনেক নেয়ামত এবং পুরস্কার । তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও মহান নেতাদের একজন। তাঁকে "খলিলুল্লাহ" বা আল্লাহর বন্ধু বলে সম্মানিত করা হয়, যা আল্লাহর সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক এবং আনুগত্যের প্রতীক। ইব্রাহিম আ. আল্লাহর পথে অবিচল থেকেছেন এবং তাঁর আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। হজ পালন এবং কুরবানির বিধান ইব্রাহিম আ:-এর জীবনের স্মৃতিস্বরূপ। তিনি এবং তাঁর পরিবার, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইল আ., ত্যাগ, ধৈর্য এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার অনন্য উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে ইব্রাহিম আ.-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্যের বিবরণ পাওয়া যায়, যা মুসলিমদের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আ:-এর বংশে নবুওয়াতের বরকত দিয়েছেন, এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেক নবী প্রেরণ করেছেন । কুরআনে আল্লাহ বারবার ইব্রাহিম আ.-এর প্রশংসা করেছেন এবং মুসলিমদের তাঁর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন।

ইব্রাহিম আ.-এর এই আত্মত্যাগ, বিশ্বাস, এবং আনুগত্য মুসলিমদের জন্য এক অসাধারণ অনুপ্রেরণা, যা তাঁদের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর পথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে শিক্ষা দেয়।

☞ **রেফারেন্স:**

১. সিরাত ইবনে হিশাম

২. যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২:১২৪-১৩৩=১০; ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০; আলে ইমরান ৩:৩৩, ৩৪, ৬৫-৬৮=৪; ৮৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭; নিসা ৪:৫৪, ১২৫, ১৬৩; আন'আম ৬:৭৪-৮৩=১০; ১৬১; তওবাহ ৯:৭০, ১১৪; হূদ ১১:৬৯-৭৬=৮; ইউসুফ ১২:৬, ৩৮; ইবরাহীম ১৪:৩৫-৪১=৭; হিজর ১৫:৫১-৬০=১০; নাহ্ল ১৬:১২০-১২৩=৪; মারিয়াম ১৯:৪১-৫০=১০; ৫৮; আম্বিয়া ২১:৫১-৭৩=২৩; হজ্জ ২২:২৬, ৪৩, ৭৮; শো'আরা ২৬:৬৯-৮৯=২১; আনকাবূত ২৯:১৬-২৭=১২; ৩১; আহযাব ৩৩:৭; ছাফফাত ৩৭:৮৩-১১৩=৩১; ছোয়াদ ৩৮:৪৫-৪৭=৩; শূরা ৪২:১৩; যুখরুফ ৪৩:২৬, ২৭; যারিয়াত ৫১:২৪-৩৪=১১; নাজম ৫৩:৩৭; হাদীদ ৫৭:২৬, ২৭; মুমতাহানা ৬০:৪-৬=৩; আ'লা ৮৭:১৯, সর্বমোট = ২০৪টি

৩. বুখারী, হা/৪৫৬৩ তাফসীর অধ্যায়, সূরা আলে-ইমরান ।

৪. বুখারী হা/২২১৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; আহমাদ, সনদ ছহীহ।

হযরত লূত আ:

✍ লূত আ: এর পরিচয়...

হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইব্রাহিম আ: এর ভ্রাতৃপুত্র । মহান চাচার মতো তিনিও ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি ইব্রাহিম আ: এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন । ইব্রাহিম আ: যখন বাবেল থেকে কেন'আনে হিজরত করেন তখন তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সারাহ্ এবং লূত আ: । তাঁর পিতার নাম ছিল হারান। ইব্রাহিম আ: যখন শাম অঞ্চলে এক আল্লাহর বাণী প্রচার করছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা লুত আ: কে অপর এক অঞ্চলে যাওয়ার আদেশ করলেন । তিনি তাঁকে 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এই আদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা লূত আ: কে নবী হিসেবে নির্ধারণ করলেন ।

সাদূূম ছিল একটি কেন্দ্রীয় নগর । আমূরা সহ বিভিন্ন জনপদ তার অধীনে ছিল । বিভিন্ন রিসার্চ অনুযায়ী, বর্তমানে জর্ডানে মৃত সাগর বা "Dead sea" নামে যে প্রসিদ্ধ সাগর আছে, সে জনপদটি এর ভেতর তলিয়ে গেছে অথবা তা এর আশপাশেই ছিল । কিন্তু তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই ।

উল্লেখ্য যে, লূত (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৫টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। **(১)**

✍ সাদূমবাসীর প্রতি লূত আ: এর দাওয়াত...

সাদূমবাসী ছিল পৌত্তলিক । দুনিয়ার এমন কোন মন্দ কাজ নেই যা তারা করত না । দুনিয়ার সকল অবাধ্য, নাফরমান ও মন্দ- চরিত্র জাতিগুলোর সমস্ত দোষ এবং অশ্লীল কার্যকলাপ ছাড়াও এই জাতি সমকামিতার মতো এক জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এই গোত্রের মানুষের প্রতি লূত আ: এর বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন, বস্তুত তোমরা এমনই অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব জগতের আর কেউ করেনি । তোমরা কি পুরুষদের কাছে উপগমন করো এবং পথে-ঘাটে ডাকাতি করো আর তোমাদের ভরা মজলিসে অন্যায় কাজে লিপ্ত হও?(সূরা আনকাবুত: ২৮-২৯) অর্থাৎ তারা যে শুধু এই কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে তাই নয় বরং তারাই মানব ইতিহাসে প্রথম যারা এমন কাজে লিপ্ত হয়েছে । তারা আরও নানা ধরনের অপরাধে লিপ্ত ছিল । তারা মুসাফির

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ডাকাতি করতো এবং তাদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকে বাছাই করে ধর্ষণ করতো । এমন একটি নিকৃষ্ট ও হঠকারী কওমের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা লুত আ: কে তাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন । তিনিও অন্যান্য নবীগণের মত প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন । তিনি তাদেরকে বললেন,

اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ۱۶۲فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۶۳﴾ۚ وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡہِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۶۴﴾ اَتَاۡتُوۡنَ الذُّکۡرَانَ مِنَ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۶۵﴾ۙ وَ تَذَرُوۡنَ مَا خَلَقَ لَکُمۡ رَبُّکُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِکُمۡ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ عٰدُوۡنَ ﴿۱۶۶﴾

আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন'। অতঃপর তিনি তাদের বদভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'বিশ্ববাসীর মধ্যে তোমরাই কি কেবল পুরুষদের নিকটে এসে থাক'? 'আর তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন কর, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' (সূরা শু'আরা ২৬:১৬২-১৬৫)। জবাবে কওমের নেতারা বলল,

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ، قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ- (الشعراء-(১৬৭-১৬৮

'হে লূত! যদি তুমি (এসব কথাবার্তা থেকে) বিরত না হও, তাহ'লে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে'। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এইসব কাজকে ঘৃণা করি' (সূরা শু'আরা ২৬:১৬৭-১৬৮)।

তারা এতই হঠকারী ও নিজেদের পাপকর্মে অন্ধ ও নির্লজ্জ ছিল যে, তাদের কেবল একটাই জবাব ছিল, তুমি যে গযবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি ।

✍ সাদূমবাসীর উপর আল্লাহর প্রেরিত শাস্তি...

একদিন লূত আ: এর কাছে খবর এলো যে শহরে অবিশ্বাস্য সুদর্শন তিনজন মুসাফির প্রবেশ করেছে । মূলত ফেরেশতাগণ লূত আ: এর কাছে সুদর্শন যুবকের বেশে হাজির হয়েছিলেন (তাঁরা ছিলেন সেই ফেরেশতা যারা লূত আ: এর কাছে আসার পূর্বে ইব্রাহিম আ: এর ঘরে গিয়েছিলেন তাকে পুত্র ইসহাক আ: জন্মের সুসংবাদ দেয়ার জন্য)। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি যে তারা ফেরেশতা । অন্যদিকে নিজ সম্প্রদায়ের বিকৃত যৌনাচার ও তাদের চরম অশ্লীলতা সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন । সঙ্গত কারণেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন । সাদূমের লোকেরা যাতে তাঁদের সম্পর্কে জানতে না পারে তাই তিনি সেই সুদর্শন তরুণদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী, যে ছিল সাদূম গোত্রের পাপাচারের পক্ষে, সে বাড়ি

থেকে বেরিয়ে জনপদের লোকদেরকে তাদের সম্পর্কে জানিয়ে দেয় । সে তাদের বলল যে, তার স্বামীর ঘরে এমন সুদর্শন তিনজন মেহমান এসেছে যাদের সৌন্দর্যের কাছে সবকিছু মলিন হয়ে যায় । এ কথা শুনে তার গোত্রের লোকজন খুশিতে আত্মহারা হয়ে লূত আ: এর বাড়িতে ছুটে এল । তারা তাঁর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো । লূত আ: এতে আতঙ্কিত হয়ে গেলেন । এই দৃশ্য দেখে তিনি তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করে বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা । তারা তোমাদের জন্য পবিত্র । কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো । আর আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জা দিওনা । তোমাদের মধ্যে কি একজন সুবোধ ব্যক্তিও নেই ?" (সূরা হুদ: ৭৮) কিন্তু তারা তাঁর কোন কথাই কর্ণপাত করল না । তারা বলল, তুমি অবশ্যই জানো তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমার কোন প্রয়োজন নেই । আর আমরা কি চাই, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো । অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিরোধে আমার যদি কোন শক্তি থাকতো অথবা আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম । (সূরা হুদ: ৭৯-৮০)

এ অবস্থায় লূত আ: আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন । তখন মেহমানেরা তাঁর কাছে তাদের পরিচয় প্রকাশ করলেন । তারা বললেন, হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশতা । তারা কখনই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। (সূরা হুদ: ৮১) অতঃপর জিবরাইল আ: তাঁর ডানা দিয়ে একটা ঝাপটা দিলেন এবং সাথে সাথে লূত আ: এর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি ব্যক্তি অন্ধ হয়ে গেল । আল্লাহ বলেন,

وَ لَقَدۡ رَاوَدُوۡهُ عَنۡ ضَیۡفِہٖ فَطَمَسۡنَاۤ اَعۡیُنَہُمۡ فَذُوۡقُوۡا عَذَابِیۡ وَ نُذُرِ ﴿۳۷﴾

'ওরা লূতের কাছে তার মেহমানদের দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিলাম। অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও হুঁশিয়ারী' (সূরা ক্বামার ৫৪:৩৭)।

ফেরেশতাগণ লূত আ: কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি রাতের কোনো এক সময় পরিবার-পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ পেছনের দিকে তাকাবে না । আপনার স্ত্রী ব্যতীত । নিশ্চয়ই তার উপর ঐ গযব আপতিত হবে, যা ওদের উপরে হবে। ভোর পর্যন্তই ওদের মেয়াদ। ভোর কি খুব নিকটে নয়'? (সূরা হূদ ১১:৮১) একবার বেরিয়ে পড়ার পর তাদেরকে পেছনে ফিরে দেখতে নিষেধ করা হয়েছিল কারণ সাদূমবাসীর উপর এমন ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল যে তারা পেছন ফিরে তাকালে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতো ।

"আপনার স্ত্রী ব্যতীত" এই কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে । যেমন- ১. তাঁর স্ত্রীকে তাদের সাথে নিতে নিষেধ করা হয়েছিল কারণ তাঁর স্ত্রী ছিল সাদূমবাসীর সাহায্যকারী । ২. আল্লাহ্ তাআলা

তাঁকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে পিছন ফিরে তাকাবে । তারা আরো বললেন,

فَاَسۡرِ بِاَہۡلِکَ بِقِطۡعٍ مِّنَ الَّیۡلِ وَ اتَّبِعۡ اَدۡبَارَہُمۡ وَ لَا یَلۡتَفِتۡ مِنۡکُمۡ اَحَدٌ وَّ امۡضُوۡا حَیۡثُ تُؤۡمَرُوۡنَ ﴿۶۵﴾

'আপনি তাদের পিছে অনুসরণ করুন। আর কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। আপনারা আপনাদের নির্দেশিত স্থানে চলে যান' (সূরা হিজর ১৫:৬৫)।

অর্থাৎ লূত আ: কে হিজরতকারী দলের পিছনে থাকতে বলা হয়েছে । আল্লাহর হুকুম শুনে লূত আ: রাতের আধারেই তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন । তাঁরা যখন এলাকা অতিক্রম করে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেলেন এবং সূর্য উদিত হলো, তখন আল্লাহর অলংঘনীয় আদেশ ও অপ্রতিরোধ্য আযাব তাদের উপর নেমে এলো । জিবরীল আ: আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র সুবহে সাদিক-এর সময় একটি প্রচন্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলিকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে আসমান থেকে প্রবল বেগে ঘুর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হলো । যেমন, আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ
مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ-

'অবশেষে যখন আমাদের হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপরে ক্রমাগত ধারায় পাকা মাটির প্রস্তর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংসস্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশী দূরে নয়' (সূরা হূদ ১১:৮২-৮৩)।

✍ লূত আ: এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয়...

হযরত লূত আ: ছিলেন একজন মহান নবী এবং হযরত ইব্রাহিম আ: এর ভাতিজা । আল্লাহ তাঁকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে, যারা নানা অনাচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিল, বিশেষত সমকামিতার মতো অপকর্মে। হযরত লূত আ: বারবার তাদের আল্লাহর পথে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তা অস্বীকার করে এবং তাঁর ওপর বিদ্রূপ করে। অবশেষে, তাদের অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তাদের ওপর কঠোর শাস্তি

প্রেরণ করেন, যা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। তাঁর এই অবিচল নিষ্ঠা ও সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁকে এক মহৎ মর্যাদায় ভূষিত করেন।
কুরআন মাজিদের বর্ণনা অনুযায়ী, এরকম অভিশপ্ত কাজ সাদূমবাসীর আগে দুনিয়ায় আর কেউ কখনো করেনি । তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর এতগুলো ভয়ংকর শাস্তি একসাথে প্রেরণ করেন । সাদূমবাসীর ধ্বংসের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় এই যে, সমকামিতা বা বিকৃত যৌনাচার এমন একটি নিকৃষ্টতম স্বভাব, যা আল্লাহর ক্রোধকে ত্বরান্বিত করে । এই কুকর্ম কেবল ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না, তা সমাজকে বিধ্বস্ত করে এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহর আযাব নেমে আসে ।

উল্লেখ্য, লূত আ: এর স্ত্রীর ঘটনাটি থেকে অনুধাবন করা যায় যে, ঈমান না থাকলে কেবল বংশ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষকে আল্লাহর গযব থেকে মুক্তি দিতে পারে না।

লূত (আ.) এর জীবন আমাদের জন্য একটি উদাহরণ, যা আমাদের সততার পথে অবিচল থাকতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর জীবনী থেকে আমরা শিখি যে, আল্লাহর পথে অবিচল থাকা এবং তাঁর বিধান মেনে চলা জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য, যা আখিরাতে আমাদের মর্যাদা বাড়াবে।

☞ রেফারেন্স:

১. যথাক্রমে সূরা আ'রাফ ৭/৮০-৮৪=৫; তওবাহ ৯/৭০; হূদ ১১/৭০, ৭৪, ৭৬-৮৩=৮; ৮৯; হিজর ১৫/৫৮-৭৭=২০; আম্বিয়া ২১/৭৪-৭৫; হজ্জ ২২/৪৩; শো'আরা ২৬/১৬০-১৭৫=১৬; নমল ২৭/৫৪-৫৮=৫; আনকাবূত ২৯/৩১-৩৫=৫; ছাফফাত ৩৭/১৩৩-১৩৮=৬; ছোয়াদ ৩৮/১৩-১৫=৩; ক্বাফ ৫০/১৩-১৪; যারিয়াত ৫১/৩১-৩৭=৭; তাহরীম ৬৬/১০; হা-ক্কক্কাহ ৬৯/৯-১০। সর্বমোট = ৮৭টি

হযরত ইসমাঈল আ:

✍ ইসমাঈল আ: এর জন্ম ও পরিচয়...

হযরত ইসমাইল আ: ছিলেন ইব্রাহিম আ: এর জ্যেষ্ঠ পুত্র । তিনি ছিলেন হযরত হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান । প্রথমদিকে হযরত ইব্রাহিম আ: ছিলেন নিঃসন্তান । ইব্রাহিম আ: ও তাঁর স্ত্রী সারাহ্ প্রথমে নিজ বাসস্থান ইরাক থেকে কেন'আনে এবং সেখান থেকে পুনরায় মিশরে হিজরত করেন । তাঁরা একসময় মিশর থেকে কেন'আনে ফিরে এলেন, এবং বছরের পর বছর কাটতে লাগলো । কিন্তু তাদের জীবনে কোথাও যেন এক শূন্যতা রয়ে গেল । তাঁর স্ত্রী সারাহ্ বুঝতে পারলেন এ হচ্ছে সন্তান না হওয়ার শূন্যতা । স্বামীর জীবনের এই শূন্যতাকে উপলব্ধি করে তিনি ইব্রাহিম আ: কে বললেন তিনি যেনো হাজেরাকে বিয়ে করেন । অতঃপর যখন তাঁদের বিয়ে হলো, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের একটি পুত্রসন্তান দান করলেন । সেই পুত্রই হলেন ইসমাইল আ: । তাঁর জন্মের সময় ইব্রাহিম আ: এর বয়স ছিল ৮৬ বছর ।
ইসমাঈল আ: এর জন্মের পূর্বে ইব্রাহিম আ: আল্লাহ তাআলার কাছে এরূপ দুআ করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান করো যে হবে সৎ লোকদের একজন ।
আল্লাহ ইসমাঈল আ: সম্পর্কে বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِياًّ- وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا-

'এই কিতাবে আপনি ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী'। 'তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি স্বীয় পালনকর্তার নিকট পছন্দনীয় ছিলেন' (মারিয়াম ১৯:৫৪-৫৫)।

✍ মক্কায় নির্বাসন...

শিশু বয়সেই ইসমাঈল আ: ও তাঁর মা হাজেরা কে আল্লাহর নির্দেশে জনমানবহীন এক ধূ-ধূ মরুভূমিতে রেখে আসেন পিতা ইব্রাহিম আ: । সেখানে কোনরূপ পানির ব্যবস্থাও ছিল না । আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি শিশু ইসমাঈল ও মা হাজেরাকে কর্কশ সেই মরুভূমির মাঝে রেখে কোনো কথা না বলে ফিরে যেতে লাগলেন । তাকে ফিরে যেতে দেখে মা হাজেরা বললেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি আমাদের এই উপত্যকা ভূমিতে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন?" তাঁর কথা শুনে ইব্রাহিম আ: নিরুত্তর রইলেন । অবশেষে হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন,

আল্লাহই কি আপনাকে আমাদের এখানে রেখে যাওয়ার আদেশ করেছেন ? ইব্রাহিম আ: এবার উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাকের আদেশেই ।” হাজেরা এটা শুনে বললেন, “যদি এটা আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই । তিনি আমাদের ধ্বংস ও বিনষ্ট করবেন না ।” ইব্রাহিম আ: তাঁদের কাছে একটি থলের মধ্যে অল্পকিছু খেজুর আর একটি মাশকে অল্পপরিমাণ পানি রেখে ফিরে এলেন । তাঁরা যখন তাঁর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই দুআ করলেন,

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُـقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡ زُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡكُرُوۡنَ ﴿۳۷﴾

“হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের আশপাশে এমন এক উপত্যকায় এনে বসবাস করিয়েছি, যেখানে কোন ক্ষেত-খামার নেই । হে আমাদের প্রতিপালক! (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা নামাজ কায়েম করে । সুতরাং, মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ।”(সূরা ইব্রাহিম: ৩৭)
হাজেরা কয়েকদিন পর্যন্ত সেই খেজুর খান এবং মশক থেকে পানি পান করেন । সেই সাথে শিশু ইসমাঈলকে দুধ পান করাতে থাকেন । কয়েক দিনের মধ্যেই সব খাবার এবং পানি শেষ হয়ে গেল । ফলে তিনি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন এবং শিশু ইসমাঈল ও তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল । শিশু ইসমাঈল একপর্যায়ে ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় ছটফট করতে লাগলো । মা হাজেরা কোনো উপায়ান্তর না দেখে নিকটস্থ সাফা পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন । যদি কোন আল্লাহর বান্দার দেখা মেলে, যদি কোন পানির সন্ধান পাওয়া যায় । কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। এরপর তিনি নিকটস্থ মারওয়া পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন । এবারও তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না । এভাবে তিনি ৭ বার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করলেন । কিন্তু কারো দেখা মিলল না । ইবনু ‘আব্বাস রা: বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এজন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে । এবার আল্লাহ তায়ালার হুকুমে স্বয়ং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে হাজির হলেন । তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে এমন ভাবে আঘাত করলেন যে, সেখান থেকে অঝোরে পানি বের হতে লাগলো এবং এমনভাবে পানি বের হতে লাগল যেন গোটা উপত্যকাই পানিতে ভরে যাবে । মা হাজেরা তখন সেখানে মাটি উঁচু করে সেখানে কুয়ার মতো বানিয়ে দিলেন। কিন্তু তবুও পানি উপচে পড়তে লাগল । হাজেরা সেখান থেকে পানি পান করলেন । এরপর শিশু পুত্র ইসমাঈলকে দুধ পান করালেন ।

অলৌকিক সেই কূপটিকেই বলা হয় “জমজম” । তখন জিবরাঈল আ: তাঁকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনঃ নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তার পরিজনকে কখনও ধ্বংস করবেন না ।

অলৌকিক জমজমের পানি দেখা দেওয়ার পর সে অঞ্চলে পাখিরা ঘোরাফেরা করা শুরু করলো । কিছুদিন পর জুরহুম গোত্রের এক ব্যবসায়ী কাফেলা সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল । তারা দেখল অনতিদূরেই পাখি উড়ছে । তারা ভাবল নিশ্চয়ই সেখানে পানি রয়েছে । মরুভূমির মাঝখানে এত পাখির কোলাহল দেখে তারা কৌতুহল নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল । তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। ইসমাঈল আ:-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদেরও সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাজেরা আ: ইন্তিকাল করেন।

ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম আ: তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দূরবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম আ:-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি

আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল আ: জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নাসীহাত করেছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল আ: বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের নিকট চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাঈল আ: তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন।

অতঃপর ইবরাহীম আ: এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল আ:-এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল আ: সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম আ: জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহীম আ: জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কী? সে বলল, গোশ্ত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কী? সে বলল, পানি। ইবরাহীম আ: দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দিন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইবরাহীম আ:সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশ্ত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশ্ত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম আ: বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল আ: যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল আ: বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ।

এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। **(১)**

কুরবানির ঘটনা...

একমাত্র শিশু পুত্র ও তার মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইব্রাহিম আ: মাঝে-মধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা-শুনা করতেন। এভাবে ইসমাইল যখন চলাফেরা করার উপযুক্ত হলেন তখন তিনি তাঁর আদরের পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং বারবার একই স্বপ্ন দেখার ফলে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন । তিনি বুঝতে পারলেন তিনি যা স্বপ্নে দেখেছেন তা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি একটি আদেশ । তখন তিনি তাঁর পুত্র ইসমাইলকে বললেন, পাছা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি । এবার চিন্তা করে বল, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী ? ছোট্ট ইসমাইল আ: বললেন, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন । ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন । (সূরা সাফ্ফাত:১০২) নিজের মনকে শক্ত করে ইব্রাহিম আ: তাঁর প্রিয় সন্তানকে নিয়ে হেঁটে চললেন তাকে কুরবানী করার জন্য । এরকম নাজুক মুহূর্তে শয়তান এসে তার সামনে হাজির হয় । মানুষের রূপ নিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে । তিনি তখন শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ করেন। তিনবার শয়তান তার সামনে হাজির হয় । তিন বারই তিনি তাকে পাথর মেরে সরিয়ে দেন । অবশেষে ইসমাইল আ: কে তিনি কাত করে শুইয়ে দিলেন আর ইসমাঈল আ: ও মাথা নিচু করে কুরবানি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান । ইব্রাহিম আ: আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজ সন্তানকে কুরবানি করার জন্য ছুরি তুলে ধরলেন এবং সেই মুহূর্তে আল্লাহর ওহী নাযিল হয় । “সুতরাং যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল । আর আমি তাঁকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইব্রাহিম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছো । নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি । নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা । আল্লাহর হুকুমে শেষ মুহূর্তে ইসমাইল আ: এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে যায় । ইসমাইল আ: জীবিত ও নিরাপদ থাকলেন ।

পবিত্র কা’বা গৃহ নির্মাণ...

একদিন যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আঃ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে

এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম আ: বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আ: বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম আ: বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল আ: বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইবরাহীম আ: বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আ: পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম আ: নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল আ: (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম আ:-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম আ: তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল আ: তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদে রব! আমাদের থেকে কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন। "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবূল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।"

✍ ইসমাঈল আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষণীয়...

ইসমাঈল আ: ইসলামের অন্যতম মহান নবী এবং মুসলিম ঐতিহ্যে তাঁর ত্যাগ, ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইসমাইল আ:-এর জীবনে ধৈর্য ও ত্যাগের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। শিশু অবস্থায় যখন তাঁকে মক্কা নগরীতে রেখে আসা হয়, তখন তিনি ও তাঁর মা হাজেরা আ: আল্লাহর উপর আস্থা রাখেন। এতে ধৈর্য ও ত্যাগের শিক্ষা পাওয়া যায় ।

ইসমাইল আ:-এর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তাঁর আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুতি। আল্লাহর আদেশে ইব্রাহিম আ: যখন তাঁকে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হন, তখন ইসমাইল আ: বিনা দ্বিধায় তাঁর পিতার সিদ্ধান্তে সম্মতি দেন। এই ঘটনা মুসলিমদের শেখায় যে, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকা একজন মুসলিমের জন্য কতটা জরুরি। তাঁর কুরবানির ঘটনা শুধু ত্যাগ নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দেয়ার শিক্ষাও দেয়। ইসমাইল আ:-এর

জীবনে পারিবারিক দায়িত্ব ও সামাজিক কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে কাবা ঘরের নির্মাণে অংশ নেন, যা ইসলামের অন্যতম পবিত্র স্থান। এই কাজের মাধ্যমে তিনি সমাজ ও ধর্মের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেন এবং মুসলমানদের জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব প্রকাশ করেন।

তাঁর অন্যতম বড় মর্যাদা এই যে, তিনি ছিলেন 'যবীহুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রাহে স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গকারী এবং তিনি হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ সা:-এর মহান পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তাঁর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন ।

☞ রেফারেন্স:

১. বুখারী ইবনু আববাস হ'তে হা/৩৩৬৪ 'আম্বিয়া কিরাম আ:' অধ্যায়।

হযরত ইসহাক আ:

✍ ইসহাক আ: এর জন্ম ও পরিচয়...

ইসহাক আ: ছিলেন ইব্রাহিম আ: এর প্রথম স্ত্রী সারাহ্-এর গর্ভজাত একমাত্র সন্তান । তাঁর জন্ম হয়েছিলো ইসমাঈল আ: এর জন্মের ১৪ বছর পর । হযরত ইব্রাহিম আ: এর বয়স যখন ১০০ বছর এবং তাঁর স্ত্রী সারাহর বয়স যখন ৯০ বছর । এ সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে একটি পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ জানালেন । আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

‘আর আমাদের প্রেরিত সংবাদবাহকগণ (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) ইবরাহীমের নিকটে সুসংবাদ নিয়ে এল এবং বলল, সালাম। সেও বলল, সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একটা ভূণা করা বাছুর এনে (তাদের সম্মুখে) পেশ করল । কিন্তু সে যখন দেখল যে, মেহমানদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে সন্দেহে পড়ে গেল ও মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল (কারণ সেকালে রীতি ছিল মেজবান খাবার পরিবেশন করা সত্ত্বেও যদি মেহমান তা গ্রহণ না করতো তবে মনে করা হতো সে একজন শত্রু এবং সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে)। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা আপনাকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও লূত্বের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তার স্ত্রী (সারা) নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। আমরা তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে (তার পুত্র) ইয়াকূবেরও। সে বলল, হায় কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এতো ভারী আশ্চর্য কথা! তারা বলল, আপনি আল্লাহর নির্দেশের বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছেন? হে গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপরে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত ও মহিমময়’ (সূরা হূদ ১১:৬৯-৭৩)।

এছাড়াও এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সূরা হিজর ৫১-৫৬ আয়াতে এবং যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াতে । আল্লাহ্ পাক কুরআনের অনেক আয়াতে ইসহাক আ: এর প্রশংসা করেছেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞানী বলে উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন, “অতঃপর তারা তাকে এক মস্ত জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিল ।”(সূরা যারিয়াত:২৮) হযরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, একজন সম্মানিত ব্যক্তি, যার পিতা ও ছিলেন সম্মানিত, তাঁর পিতা ও ছিলেন সম্মানিত এবং তাঁর পিতাও ছিলেন সম্মানিত । তিনি হলেন ইউসূফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আ: ।

✍ ইসহাক আ: এর পরিবার ও সন্তান-সন্ততি...

ইব্রাহিম আ: তাঁর জীবদ্দশায়ই পুত্র ইসহাক কে রাফাক্কা বিনতে বাতওয়াঈল এর সাথে বিবাহ দেন। রাফাক্কা ছিলেন বন্ধ্যা । তাই ইসহাক আ: সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন । এরপর তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হোন এবং তাঁর গর্ভ দুটি যমজ পুত্র সন্তান জন্ম নেয় । তাঁদের নাম রাখা হয় ঈস ও ইয়াকুব । তাদের মধ্যে ইয়াকুব পরবর্তীকালে নবী হন । তাঁর বংশধরদেরকেই বলা হতো বনি ইসরাইল ।

ইয়াকুবের বংশধর হিসাবে বনু ইসরাইলের হাজার হাজার নবী পৃথিবীকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করেন। কিন্তু ইহুদী নেতাদের হঠকারিতার কারণে তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয় এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে নিন্দিত হয়। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

✍ ইসহাক আ: এর মৃত্যু...

ইসহাক আ: ১৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন । তিনি কেন‘আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ঈস ও ইয়াকুব তাঁকে তাঁর পিতা ইবরাহীমের কবরের পাশে সমাহিত করেন । স্থানটি এখন ‘আল-খালীল’ নামে পরিচিত’।**(১)**

☞ রেফারেন্স:

১. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১

হযরত ইয়াকুব আ:

✍ ইয়াকুব আ: এর পরিচয়...

ইয়াকুব আ: ছিলেন ইসহাক আ: এর পুত্র । ইসহাক আ: এর জমজ দুই পুত্র ঈস এবং ইয়াকুবের মধ্যে ইয়াকুব আ: ছিলেন ছোট । দুই ভাইয়ের মধ্যে পরবর্তীকালে ইয়াকুব আ:-কে আল্লাহ্ তাআলা নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন । তাঁর মায়ের নাম রাফাক্কা বিনতে বাতওয়াঈল । তিনি তাঁর মায়ের অত্যাধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন ।
ইয়াকুব আ: এর অপর নাম ছিল 'ইসরাইল' ।**(১)** ইবরানি ভাষায় 'ইসরা' শব্দের অর্থ দাস এবং 'ইল' অর্থ আল্লাহ । এই দুই শব্দের সমন্বয়ে গঠিত ইসরাইল শব্দের আরবি অর্থ 'আব্দুল্লাহ'- আল্লাহর বান্দা/দাস । হযরত ইব্রাহিম আ:- এর পুত্র ইসহাক আ:-এর বংশধরগণ যারা ইয়াকুব আ:-এর বংশোদ্ভূত তাদেরকে ইবরানি নামানুসারে "বনী ইসরাইল" বলা হয় ।

✍ ইয়াকুব আ: এর পরিবার ও সন্তান-সন্ততি...

ইসরায়েলি বর্ণনা অনুযায়ী, ইয়াকুব আ: হারানে মামার বাড়িতে গিয়ে সেখানে তিনি তার মামাতো বোন 'লাইয়া' (لَيّا) ও পরে 'রাহীল' (راحيل)-কে বিবাহ করেন এবং দু'জনের মোহরানা অনুযায়ী ৭+৭=১৪ বছর মামার বাড়ীতে দুম্বা চরান। ইবরাহীমী শরী'আতে দু'বোন একত্রে বিবাহ করা জায়েয ছিল। পরে মূসা (আঃ)-এর শরী'আতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়। শেষোক্ত স্ত্রী রাহিল বিনতে লাবান এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বসেরা সুন্দর পুরুষ ইউসুফ আ: এবং তাঁর ভাই বিনইয়ামিন । তবে কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি । শুধু এতোটুকু উল্লেখ রয়েছে যে, ইয়াকুব আ: ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাবান পয়গম্বর । ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং হযরত ইউসুফ আ:-এর পিতা । ইয়াকুব আ: এর ১২ জন পুত্র ছিল । বিনইয়ামিন ছাড়া তাঁর বাকি সকল পুত্রই ফাদ্দানে জন্মগ্রহণ করেন । শুধু বিনইয়ামিনই কেন'আনে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর ১২ জন পুত্রের মধ্যে কেবল ইউসুফ আ: নবী হন ।

✍ ইয়াকুব আ: এর ওসিয়ত...

ইয়াকুব আ: কেন'আন থেকে মিসরে পুত্র ইউসুফ এর কাছে আসার ১৭ বছর পর মতান্তরে ২৩ বছরের অধিক কাল পরে ইন্তেকাল করেন । মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে ওসিয়ত করেন।
সে ওসিয়তটির মর্ম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে বলেন,

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَّاحِداً وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ- (البقرة-(১৩৩

'এরই ওসিয়ত করেছিল ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' (সূরা বাক্বারাহ:১৩২)। 'তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক্বের উপাস্যের ইবাদত করব- যিনি একক উপাস্য এবং আমরা সবাই তাঁর প্রতি সমর্পিত' (সূরা বাক্বারাহ ২:১৩৩)।

শুরুতে বলা হয়েছে 'এরই অছিয়ত করেছিলেন ইবরাহীম। কিন্তু সেটা কি ছিল? আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ- (البقرة-(১৩১

'স্মরণ কর যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, আত্মসমর্পণ কর। সে বলল, আমি বিশ্বপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম' (সূরা বাক্বারাহ ২:১৩১)। অর্থাৎ ইবরাহীমের ওসিয়ত ছিল তাঁর সন্তানদের প্রতি ইসলামের । এজন্য ইবরাহীম আ: তাঁর অনুসারীদের নাম রেখেছিলেন- 'মুসলিম' বা আত্মসমর্পিত (সূরা হজ্জ ২২:৭৮)। তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকুব আ: ও আপন সন্তানদেরকে যে খালেস দ্বীনের প্রতি ওসিয়ত করেন, তা হলো দ্বীন ইসলাম । যে দ্বীনসহ সমস্ত নবীকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন ।

ইয়াকুব আ: কেন'আনবাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন । বহুবছর পর্যন্ত তিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেন । পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলি হযরত ইউসুফ আ: এর জীবনীতে আলোচনা করা হয়েছে ।

☞ রেফারেন্স:

১. আলে-ইমরান ৩/৯৩ ; মারিয়াম ১৯/৫৮।

হযরত ইউসুফ আ:

✍ ইউসুফ আ: এর পরিচয়...

হযরত ইউসুফ আ: ছিলেন ইয়াকুব আ: এর পুত্র । অর্থাৎ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আ: । তাঁর মায়ের নাম রাহিল বিনতে লাবান । ইয়াকুব আ: এর ১২জন পুত্র ছিল। ইউসুফ আ: ও তাঁর ছোট ভাই বিনইয়ামিন ছিলেন একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান । বিনইয়ামিন জন্মের পরে তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন । ইয়াকুব আ: ১২জন পুত্রের মধ্যে ইউসুফ আ: কে বিশেষভাবে অত্যধিক স্নেহ ও মুহাব্বত করতেন । তাঁর শান্ত চোখগুলোয় টগবগ করত এক সুপ্ত প্রতিভা।

✍ কুরআনে হযরত ইউসুফ আ:...

হযরত ইউসুফ আ: হলেন একমাত্র নবী, যার সম্পূর্ণ ঘটনা বিশদভাবে একটি মাত্র সূরায় বর্ণিত হয়েছে । এই সূরাটি পবিত্র কুরআনের একমাত্র সূরা যেখানে সম্পূর্ণ সূরা জুড়েই একটি মাত্র গল্প ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে আর কোন গল্পই এতটা বিস্তারিতভাবে ও এমন ধারাবাহিকভাবে করা হয়নি ।

মক্কার কাফেরদের পক্ষ হতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরতিশয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছিল তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব সা: ও তাঁর মহান সাহাবীগণের জন্য সান্ত্বনাবাণী স্বরূপ এই সূরাটি নাযিল করলেন-

الٓرٰ ۟ تِلۡکَ اٰیٰتُ الۡکِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ ۟﴿۱﴾ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰہُ قُرۡءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۲﴾ نَحۡنُ نَقُصُّ
عَلَیۡکَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بِمَاۤ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنَ ٭ۖ وَ اِنۡ کُنۡتَ مِنۡ قَبۡلِہٖ لَمِنَ الۡغٰفِلِیۡنَ ﴿۳﴾

“আলিফ-লাম-রা । এগুলো সত্যকে পরিস্ফুটনকারী কিতাবের আয়াত । আমি একে আরবি ভাষার কুরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। হে নবী! আমি অহী মারফত এই যে কুরআন তোমার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে তোমাকে এক উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি, যদিও তুমি এর আগে এ সম্পর্কে বিলকুল অনবহিত ছিলে ।”(সূরা ইউসুফ: ১-৩)

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, মদিনার কতক ইহুদী রাসূল সা: এর কাছে প্রশ্ন করেছিল, বনি ইসরাঈল ফিলিস্তিন থেকে মিসরে গিয়ে অভিবাসী হয়েছিল কেন? তাদের ধারণা ছিল তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না । যেহেতু বনী ইসরাইলের ইতিহাস জানার মত কোন সূত্র তাঁর কাছে ছিল না । ইহুদী নেতাদের সূক্ষ্ম পলিসি ছিল এই যে, উক্ত বিষয়ে উম্মী নবী মুহাম্মাদ-এর পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব না হলে লোকদের মধ্যে তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহ

সৃষ্টি হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা জোরদার করা যাবে। তাদের সেই দুর্ভিসন্ধিমূলক প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ সূরা ইউসুফ নাযিল করেন ।

✐ইউসুফ আ: এর স্বপ্ন এবং তাঁকে কুয়ায় নিক্ষেপ...

ছোট্ট ইউসুফ একদিন তার বাবা ইয়াকুব আ: এর কাছে এসে বলল, সে নাকি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে । এই কথা শুনে তার বাবা জানতে চাইলেন, সে স্বপ্নে কী দেখেছে । ইউসুফ আঃ বললেন, “আমি স্বপ্ন যোগে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র কে দেখেছি । আমি দেখেছি তারা সকলে আমাকে সিজদা করছে ।”(সূরা ইউসুফ:৪) ইউসুফ আ: যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা তাঁর বাবার জানা ছিল । তাই তিনি তাঁকে বললেন, বাবা নিজের এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না । কারণ তারা জানলে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে । কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ।(সূরা ইউসুফ:৫) ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আশংকা ছিল এ স্বপ্নের কথা শুনলে তাঁর সৎ ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়তে পারে এবং শয়তানের প্ররোচনায় তারা হযরত ইউসুফ আ: এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ।

ইউসুফ আ: এর ভাইয়েরা তার স্বপ্নের কথা না জানলেও তাঁর প্রতি তাঁর ভাইদের মনের তীব্র হিংসা জন্ম নিল । কারণ তারা লক্ষ্য করতো যে, বাবা ইয়াকুব আ: ইউসুফকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন । এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে গেল । তাই তারা পরিকল্পনা করতে লাগলো কিভাবে ইউসুফকে তাদের জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা যায় । তাদের ধারণা ছিল ইউসুফ কে সরাতে পারলে তারা হয়ে উঠবে তাদের বাবার প্রিয় পাত্র । তারা পরস্পরে বলেছিল, “নিশ্চয়ই আমাদের পিতার কাছে আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার ভাই বেশি প্রিয় অথচ আমরা (তার পক্ষে) একটি সুসংহত দল । আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের পিতা সুস্পষ্ট কোন বিভ্রান্তিতে নিপতিত । সুতরাং এর সমাধান এই যে, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো অথবা তাকে অন্য কোনো স্থানে ফেলে এসো, যাতে তোমাদের পিতার সবটা মনোযোগ কেবল তোমাদেরই দিকে চলে আসে । আর এসব করার পর তোমরা (তাওবা করে) ভালো লোক হয়ে যাবে । তাদের মধ্যে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না। বরং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোন গভীর কুয়ায় ফেলে দাও । যাতে কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যায় ।”(সূরা ইউসুফ: ৮-১০) সুতরাং তারা একদিন তাদের বাবাকে বলল, আব্বা! আপনার কি হল যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখেন না? অথচ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী । আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে বেড়াতে পাঠান । সে খাবে দাবে এবং খানিকটা খেলাধুলা করবে । বিশ্বাস করুন আমরা তাকে হেফাজত

করব । ইয়াকুব আ: ভালোভাবেই জানতেন যে, তারা ইউসুফ আ: এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো । তিনি সরাসরি তাদের প্রতি আক্রমনাত্মক না হয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার কষ্ট হবে এবং আমার এই ভয়ও আছে যে কখনো তার প্রতি তোমরা অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে । তারা বলল, আমরা একটি সুসংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের থেকে হতভাগা আর কে হতে পারে । (সূরা ইউসূফ:১১-১৪) অনিচ্ছাকৃতভাবে ইয়াকুব আ: তাদেরকে অনুমতি দিলেন ইউসুফ আ:-কে নিয়ে খেলতে যাওয়ার জন্য । পরিকল্পনা অনুযায়ী বাইরে যাওয়ার পর তারা তাদের ভাই ইউসুফকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল এবং ফেলার আগে তার পরনের জামা খুলে তাতে নকল রক্ত মাখিয়ে দিল । রাত্রি তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসলো । বলতে লাগলো, আব্বাজি! বিশ্বাস করুন, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় চলে গিয়েছিলাম । আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম । এই অবকাশে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে । কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, তাতে আমরা যতই সত্যবাদী হই ।(সূরা ইউসুফ:১৬-১৭) তারা ইউসুফ আ: এর জামায় রক্ত মাখিয়ে এনেছিল ঠিকই, কিন্তু জামাটি ছিল অক্ষত । কোথাও ছেড়া-ফারার কোন চিহ্ন ছিল না । এসব দেখে ইয়াকুব আ: বুঝতে পারলেন যে তারা তাকে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলছে । তিনি তাদের বললেন, আসলে যা হয়েছে তা হল, তোমাদের নাফস তোমাদেরকে খুবই নিকৃষ্ট কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে । সুতরাং আমার জন্য ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয় । আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছো সে ব্যাপারে আমি আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি।(সূরা ইউসুফ:১৮)

✍ কুয়া হতে উদ্ধার...

অন্যদিকে ধুধু মরুভূমির মধ্য দিয়ে এক ব্যবসায়ী কাফেলা যাত্রা করছিল । ইউসুফ আ:-কে যে কুয়ায় ফেলা হয়েছিল, সেখানে আসলো । কিছু স্কলারদের মতে, পথ হারিয়ে সেই কাফেলা সেখানে পৌঁছেছিল । তারা তাদের একজন লোককে পানির সন্ধানে পাঠিয়ে দিল । সেই লোক পানি তোলার জন্য যখন কুয়ায় নিজ বালতি ফেলল, ওমনি দেখল ওই অন্ধকারে দুটি চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে । অতঃপর ইউসুফ আ: সে বালতিতে সওয়ার হলেন । লোকটি বালতি টেনে তুলতেই দেখতে পেল তার ভিতর একটি বালক । অনিন্দ্য সুন্দর বালক দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, “তোমরা সুসংবাদ শোনো, এ যে একটি বালক । অতঃপর যাত্রীদলের লোক তাকে একটি পণ্য মনে করে লুকিয়ে রাখল এবং তারা ইউসুফ আ:-কে অতি অল্প দামে বিক্রি করে দিল । যা ছিল মাত্র কয়েক দিরহাম । বস্তুত, ইউসুফ আ: এর প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না ।”(সূরা ইউসুফ:১৯-২০)

✍ ইউসুফ আ:-এর মিসরের জীবন...

যে কাফেলা ইউসুফ আ:-কে কুয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিসরে নিয়ে গেল এবং সেখানে তারা তাঁকে কয়েকদিন দিরহামের বিনিময়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিল । আত তাবারি উল্লেখ করেন, সে সময় মিসরের বাদশাহ ছিলেন রাইয়ান ইবনে ওয়ালিদ। আর মিসরে যে ব্যক্তিটি তাকে ক্রয় করেছিল, সে ছিল সেই দেশের অর্থমন্ত্রী । তার উপাধি ছিল 'আযীয' । আযীয ছিলেন নিঃসন্তান । আযীয ছোট্ট ইউসুফকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, "একে সম্মানজনক ভাবে রাখার ব্যবস্থা কর । আমার মনে হয় সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র বানিয়ে নেব ।"(সূরা ইউসুফ:২১)তাদের কোন সন্তান ছিল না বিধায় ইউসুফের কমনীয় চেহারা ও নম্র-ভদ্র ব্যবহারে তাদের মধ্যে সন্তানের মমতা জাগ্রত হয়ে উঠলো । এবং এই সবই ছিল আল্লাহর পরিকল্পনা ।

দাস হিসেবে বিক্রি হলেও তিনি যখন একজন সুসভ্য প্রতাপশালী ও আড়ম্বরপূর্ণ ধনবান লোকের গৃহে পৌঁছালেন, তখন নিজের নিষ্পাপ জীবন, ধৈর্য, গাম্ভীর্য এবং বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতারূপী পবিত্র গুণাবলীর বদৌলতে তাঁর মনিবের চোখের মনি এবং প্রাণের মালিক হয়ে যান ।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ (٢١)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, তাকে কথাবার্তার সঠিক মর্ম শেখানোর জন্য । নিজ কাজে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান কিন্তু বহু লোক তা জানে না ।"(সূরা ইউসুফ:২১)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইবনে ইসহাক রহ. ইবনে মাসুদ রা: থেকে বর্ণনা করেছেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি ছিলেন সর্বাধিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন । একজন হ'লেন 'আযীযে মিসর' (যিনি ইউসুফের চেহারা দেখেই তাঁকে চিনেছিলেন) । দ্বিতীয়, শো'আয়েব আ:-এর ঐ কন্যা, যে মূসা আ: সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিল, হে পিতা! আপনি এঁকে আপনার কর্মসহযোগী হিসাবে রেখে দিন। কেননা উত্তম সহযোগী সেই-ই, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়' (ক্বাছাছ ২৮:২৬)। তৃতীয়, হযরত আবুবকর সিদ্দীক্ব, যিনি ওমর ফারূককে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেছিলেন'।**(১)**

✍ইউসুফ আ: এর যৌবনকাল...

একের পর এক পরীক্ষা আর স্বস্তির ধারাবাহিকতায় বেড়ে উঠতে লাগলেন ইউসুফ আ: । যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞামান মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠলেন । আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَّعِلْماً وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (٢٢)

"ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে হিকমত ও ইলম দান করলাম । যারা সৎকর্ম করে এভাবেই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি ।" (সূরা ইউসুফ:২২)

ইউসুফ আ: যখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করলেন, রূপসৌন্দর্যের এমন কোন দিক ছিল না যা তার মধ্যে ছিল না । তিনি অবিশ্বাস্য সুদর্শন এক পুরুষ হয়ে বেড়ে উঠলেন । যাকে মে'রাজের রাতে দেখে রাসুল সা: বলেন, "আল্লাহ যেন তাকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দিয়ে দিয়েছেন ।" মে'রাজের রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "অতঃপর জিব্রাইল আ: আমাকে তৃতীয় আকাশে আরোহন করালেন । সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম । তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। আমি বললাম হে জিব্রাইল! ইনি কে ? তিনি বললেন, ইনি ইয়াকুব আ: এর পুত্র ইউসুফ আ: ।"

এই অনিন্দ্য সুন্দর মোহনীয় রূপও বাস্তবে তাঁর জন্য এক বিরাট পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইউসুফ আ: এর অনন্য সাধারণ পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্যের প্রতি আযীয এর স্ত্রী যার নাম ছিল যুলায়খা, তাঁর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলো ।

একদিন সে ইউসুফ আ: কে তার ঘরে একা পেয়ে তড়িঘড়ি করে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং কামনার ঘোরে মত্ত হয়ে তাঁকে পাপকর্মের আহ্বান জানিয়ে বসলো । পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, "যে নারীর ঘরে সে থাকতো, সে তাঁকে ফুলানোর চেষ্টা করলো এবং সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিল এবং বলল, এসে পড়ো।" এমন পরিস্থিতিতে ইউসুফ আ: বললেন, আল্লাহ্ পানাহ! তিনি আমার মনিব । তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন । সত্য কথা হচ্ছে, যারা জুলুম করে তারা কৃতকার্য হয় না। (সূরা ইউসুফ:২৩-২৪) তাঁর জন্য যে এই পরিস্থিতি কতটা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল তা পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করে বলেন,

"স্ত্রীলোকটি তো স্পষ্টভাবেই ইউসুফের সাথে (অসৎকর্ম) কামনা করেছিল । আর ইউসুফের মনেও স্ত্রীলোকদের প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়েই যাচ্ছিল যদি না সে নিজ প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে পেত । আমি তার থেকে অসৎকর্ম ও অশ্লীলতাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছিলাম । নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।"(সূরা ইউসুফ:২৪)

অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন না পেলে ইউসুফ আ: এর মত পবিত্র চরিত্রের মানুষও এই কঠিন মুহূর্তে দুর্বল হয়ে যেতে পারতেন । (কেননা নবীগণ মানুষ ছিলেন । তাদের মধ্যেও ছিল মনুষ্যসুলভ স্বাভাবিক প্রবণতা । এবং আল্লাহর এই নিদর্শন কী ছিল তা নিয়ে মুফাসসিরগণের

মধ্যে মতভেদ রয়েছে । কিন্তু মূল বিষয়টি এই যে, ইউসুফ আ: আল্লাহর সাহায্যেই আযীযের স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করার মনোবল প্রদর্শন করতে পেরেছেন । কিন্তু যুলায়খা তাঁর মত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি । অতঃপর ইউসুফ আ: পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। এবং তারা একজনের পেছনে আরেকজন দৌঁড়ে দরজার দিকে গেল এবং এই টানা-হেঁচড়ার ভেতর যুলায়খা তার জামা পেছন দিক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল । এই অবস্থায় তারা আযীযকে দরজায় দাঁড়ানো পেল । তাকে দেখে যুলায়খা তৎক্ষণাৎ তার স্বামীকে বলল, ইউসুফ আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিল । সে বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কারারুদ্ধ করা বা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে? ইউসুফ আঃ বললেন, সে নিজেই তো আমাকে ফুসলাচ্ছিল । এসব শুনে আযীয গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন । অতঃপর আল্লাহ তাআলা যুলায়খারই পরিবারের এক ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বানিয়ে দিলেন । সে বলল সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করার জন্য একটি উপায় রয়েছে । যদি ইউসুফের জামার সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে যুলায়খাই সত্য বলেছে আর ইউসুফ মিথ্যাবাদী । আর যদি তার জামা পিছন থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে যুলায়খা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী । অতঃপর যখন আযীয দেখলো তার জামা পেছন থেকে ছিঁড়েছে, তখন সে বলল, “এটা তোমাদের নারীদের ছলনা বস্তুত তোমাদের ছলনা বড়ই কঠিন । ইউসুফ! তুমি এ বিষয়টাকে একদম পাত্তা দিও না । আর হে নারী! তুমি নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও নিশ্চয়ই তুমি অপরাধী ছিলে ।”

কিন্তু ব্যাপারটা এপর্যন্তই থেমে থাকল না । নগরে কতিপয় নারী বলাবলি করলো, “আযীযের স্ত্রী তার তরুণ গোলামকে ফুসলাচ্ছে । তরুণটির ভালোবাসা তাকে বিভোর করে ফেলেছে আমাদের ধারণা সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে ।” সুতরাং যখন সে সেই নারীদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, সে আবারো একটি পরিকল্পনা করল । তখন সে বার্তা পাঠিয়ে ওইসব নারীদেরকে নিজগৃহে ডেকে আনলো এবং তাদের জন্য তাকিয়া বিশিষ্ট একটি জলসার ব্যবস্থা করল এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, একটু বের হয়ে তাদের সামনে আসো । অতঃপর সেই নারীরা যেই না ইউসুফকে দেখল, তাকে বিস্ময়কর রকমের রূপবান পেল এবং তারা তার অপরূপ রূপে হতভম্ব হয়ে নিজ নিজ হাত কেটে ফেললো । আর তারা বলে উঠল, আল্লাহ পানাহ! এ ব্যক্তি কোন মানুষ নয় । এ সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না । আযীযের স্ত্রী বলল, এবার দেখো, এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করেছো । এ কথা সত্যই যে, আমি আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলানি দিয়েছিলাম । কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে । সে যদি আমার কথা না শোনে তবে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে নির্ঘাত লাঞ্ছিত হবে । তাদের এরূপ কথাবার্তা শুনে ইউসুফ আ: আল্লাহর নিকট দু’আ করলেন,

হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগারই আমার বেশি পছন্দ । তুমি যদি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না করো তবে আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবে এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব । আল্লাহ তাআলা তার দু'আ কবুল করলেন এবং সেই নারীদের ছলনা থেকে তাকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । অতঃপর ইউসুফ আ: এর পবিত্রতার বহু নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও আযীয যেহেতু ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে চাচ্ছিল এবং ভাবল ইউসুফকে কেন্দ্র করে যখন এত কিছু ঘটছে তবে কিছু সময়ের জন্য তাকে কারাগারে পাঠানোই সমীচীন হবে ।(সূরা ইউসুফ:২৫-৩৫)

✍ কারাগারে ইউসুফ আ:...

ইউসুফ আ: এর সাথে আরো দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল । রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তাদের একজন বাদশাহকে মদ পান করাতো আর দ্বিতীয়জন ছিল তার বাবুর্চি । তাদের প্রতি বাদশাহকে বিষ পান করানোর অভিযোগ ছিল এবং সেটাই তাদের কারাবাসের কারণ । একদিন তাদের একজন ইউসুফ আ: কে বলল, আমি স্বপ্নে নিজেকে দেখলাম মদ নিংড়াচ্ছি । আর দ্বিতীয়জন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে নিজ মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে । তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দাও । আমরা তোমাকে একজন ভালো মানুষ দেখছি । ইউসুফ আ: যখন দেখলেন তারা দুজন স্বপ্নের তাবীরের ব্যাপারে তাঁর প্রতি আস্থাশীল এবং তারা তাঁকে একজন ভালো লোক বলেও বিশ্বাস করে, তখন স্বপ্নের তাবীর বলার আগে তাদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া সমীচীন মনে করলেন । তিনি বললেন, "কারাগারে তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে এর রহস্য বলে দেব । এটা সেই জ্ঞানের অংশ যা আমার প্রতিপালক আমাকে দান করেছেন । কিন্তু তার আগে তোমরা আমার একটা কথা শোনো । ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না ও যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেছি । আমি আমার বাপ-দাদা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন অনুসরণ করেছি । আমাদের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন জিনিসকে শরীক করব । এটা (অর্থাৎ তাওহীদের আকিদা) আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহেরই অংশ কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর আদায় করে না । হে আমার কারা সঙ্গিদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না সেই এক আল্লাহ, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী? তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছো । আল্লাহ তার পক্ষে কোন দলিল নাজিল করেননি । হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য

কারো নেই । তিনিই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করো না । এটাই সরল সোজা পথ । কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না ।”(সূরা ইউসুফ:৩৭-৪০)

এরপর তিনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন । তিনি বললেন, হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজনের ব্যাপার এমন যে, সে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ মনিবকে মদ পান করাবে । আর অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে । ফলে পাখিরা তার মাথা ঠুকরে ঠুকরে খাবে । তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলে তার ফয়সালা এভাবে হয়ে গেছে । স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে তিনি তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন কারণ তিনি চাইছিলেন যাকে শূলে চড়ানো হবে, সে যাতে মৃত্যুর আগেই ঈমান আনয়ন করে । তাহলে তার আখেরাতের জীবনে মুক্তি লাভ হবে । সেই দুজনের মধ্যে যার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, ইউসুফ আ: তাকে বললেন, নিজ প্রভুর কাছে আমার কথাও বলো । অর্থাৎ সে যেন বাদশাহের কাছে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার দক্ষতার কথা প্রকাশ করে । কিন্তু শয়তান তাকে বাদশাহের কাছে ইউসুফের বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল । সুতরাং তাঁকে আরো কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হলো ।(সূরা ইউসুফ:৪১-৪২)

✍ মিসরের বাদশাহর স্বপ্ন...

কয়েক বছর পরের কথা, একদিন মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন । তিনি দেখলেন, সাতটি মোটাতাজা গাভি যাদেরকে সাতটি রোগা-পটকা গাভী খেয়ে ফেলেছে । আরো দেখলেন, সাতটি সবুজ এবং আরো সাতটি শুকনো শীষ। তিনি তার পারিষদবর্গদের ডেকে তার স্বপ্নের কথা জানালেন । তিনি বললেন, হে পারিষদবর্গ ! তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানলে আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও । কিন্তু তারা কেউ সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারল না । তারা বলল, মনে হচ্ছে এটা নিছকই দুশ্চিন্তাপ্রসূত কল্পনা । আর আমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইলমদারও নই ।

বাদশাহ যখন নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, তখন সেই দুই কয়েদির (যারা কারাগারে ইউসুফ আ: এর সাথে ছিল) মধ্যে একজন কয়েদি, যে মুক্তি লাভ করেছিল, তার তখন মনে পড়ল যে ইউসুফ আ: এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের বিশেষ জ্ঞান রয়েছে । সুতরাং, এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদান তাঁর পক্ষেই সম্ভব । তাই সে বাদশাহ কে বলল, কারাগারে একজন লোক আছে । যে স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে । আপনি আমাকে কারাগারে তার কাছে পাঠিয়ে দিন। তাকে কারাগারে পাঠানো হলে সে ইউসুফ আ: এর কাছে গিয়ে বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো । ইউসুফ আ: স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বললেন, তোমরা একাধারে সাত বছর শস্য

উৎপন্ন করবে । এই সময়ের ভেতর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে, তা তার শীষসহ রেখে দিও । অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমাদের খাওয়ার কাজে লাগবে তার কথা আলাদা । এরপর তোমাদের সামনে আসবে এমন সাতটি বছর, যা অত্যন্ত কঠিন হবে । অর্থাৎ অনবরত সাত বছর দুর্ভিক্ষ চলবে । তোমরা এই সাত বছরের জন্য যা সঞ্চয় করে রাখবে, তা খেতে থাকবে অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমরা সংরক্ষণ করবে কেবল তাই অবশিষ্ট থাকবে । অর্থাৎ সাতটি রোগা-পটকা গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে এর দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, সুদিনের সাত বছরে যে শস্য সঞ্চয় করা হয়েছিল দুর্ভিক্ষের সাত বছরে তা খাওয়া হবে । তারপর আসবে এমন একটি বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তারা আঙ্গুরের রস নিংড়াবে । ইউসুফ আ: স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা বাদশাহকে জানানো হলো । বাদশাহ সে ব্যাখ্যা শুনে তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করলেন । তাই তিনি নিজের একজন দূতকে কে তাঁর নিকট পাঠালেন । বাদশাহ বললেন, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো ।

অতঃপর দূত ইউসুফ আ: এর কাছে বার্তা নিয়ে গেল । কিন্তু ইউসুফ আ: কারাগার থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাজি হলেন না । তিনি চাইলেন প্রথমে তাঁর ওপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের মীমাংসা হয়ে যাক । তাই তিনি দূতকে বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে সেই নারীদের সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য বললেন, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল । বাদশাহ তাঁর এরূপ দৃঢ়তা দেখে আরো অভিভূত হয়ে গেলেন এবং সেই নারীদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, "তোমরা যখন ইউসুফকে ফুসলাচ্ছিলে, তখন তোমাদের অবস্থা কী হয়েছিল ?" তারা বলল, "আল্লাহ পানাহ্! আমরা তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও দোষ পাইনি ।" আযীযের স্ত্রীকেও যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, সেও তা স্বীকার করে বলল, "এবার সত্য কথা সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে । আমিই তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলাম । প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী ।" সে আরো বলল, আমি এসব করেছি এজন্য, যাতে আযীয নিশ্চিত রুপে জানতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না । আমি এই দাবি করি না যে, আমার মন সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র । বস্তুত মন সর্বদা মন্দ কাজেরই আদেশ করে অবশ্য আবার রব যদি দয়া করেন সেটা ভিন্ন কথা । নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।" বাদশাহর নিকট যখন ইউসুফ আ: এর একের পর এক গুণাবলী প্রকাশ পেল, তখন বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো । আমি তাকে আমার একান্ত সহযোগী বানাবো । যখন ইউসুফ আ: বাদশাহর কাছে আসলেন, তখন তিনি বললেন, "আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে । তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে ।" অর্থাৎ বাদশাহ তাঁকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত করতে চাইলেন । ইউসুফ আ: বললেন, "আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের

ব্যবস্থাপনা কার্যে নিযুক্ত করুন । নিশ্চিত থাকুন আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি এ কাজের পূর্ণ জ্ঞান রাখি ।”

তাঁর এই পদ প্রার্থনা ও নিজের যোগ্যতা নিজ মুখে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য ছিল না। বরং তাঁর আশঙ্কা ছিল, আসন্ন দুর্ভিক্ষকালে মানুষ অন্যায়-অবিচারের সম্মুখীন হতে পারে । ইবনু কাছীর বলেন, এর মধ্যে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার দলীল রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে আমানতদার ও যোগ্য বলে নিশ্চিতভাবে মনে করেন’।**(২)** কুরতুবী বলেন, যখন কেউ নিশ্চিতভাবে মনে করবেন যে, এ ব্যাপারে তিনি ব্যতীত যোগ্য আর কেউ নেই, তখন তাকে ঐ পদ বা দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কেউ যোগ্য থাকে, তবে চেয়ে নেওয়া যাবে না। মিসরে ঐ সময় ইউসুফের চাইতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যোগ্য ও আমানতদার কেউ ছিল না বিধায় ইউসুফ উক্ত দায়িত্ব চেয়ে নিয়ে ছিলেন’।**(৩)** আত্মস্বার্থ হাছিল বা পাপকাজে সাহায্য করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় ইউসুফ আ: মিসরের সর্বোচ্চ পদে সসম্মানে বরিত হ’লেন এবং অন্ধকূপে হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ পুনরায় দীপ্ত সূর্যের ন্যায় পৃথিবীতে বিকশিত হয়ে উঠলেন। আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ- (يوسف-٥٦)

‘এমনিভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠা দান করি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমরা আমাদের রহমত যাকে ইচ্ছা তাকে পৌঁছে দিয়ে থাকি এবং আমরা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না’ (ইউসুফ ১২/৫৬)।

✍ দুর্ভিক্ষ ও মিসরে ভাইদের আগমন...

মাস ঘুরিয়ে বছর পার হল । দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য ইউসুফ আ: যে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, সেই অনুযায়ী তারা খাদ্য সঞ্চয় করতে লাগলো । এমনি করে সাতটি বছর পার হয়ে গেল এবং ইউসুফ আ: এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এরপর থেকে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল । দুর্ভিক্ষের কারণে শুধু মিসরেই নয় বরং আশপাশের ও দূর-দূরান্তের দেশগুলোতেও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছিল । তারা যখন খবর পেল যে, মিসরের বাদশাহ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্য ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করেছে, তখন দলে দলে লোকেরা মিসরে আসতে শুরু করলো । সেই দলগুলোর মধ্যে একটি দল ছিল ইউসুফ আ: এর ভাইয়েরা । এরাই তারা

যারা তাঁর শৈশবকালে তাঁকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল । যেহেতু মিসরে রেশন বন্টনের যাবতীয় কাজ ইউসুফ আ: তদারকি করছিলেন, তাই সকলকে তাঁর কাছে হাজির হতে হতো । সে অনুসারে তাঁর ভাইয়েরাও তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল । তাদের দেখা মাত্রই ইউসুফ আ: তাদেরকে চিনে ফেললেন । কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না । ইউসুফ আ: তাদের দশ ভাইয়ের প্রত্যেককে এক উট বোঝাই রসদ দান করলেন এবং তিনি তার ভাইদেরকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন । তারা কোথা থেকে এসেছে, কী করে না করে এই সমস্ত বিষয় জানতে চাইলেন । তারা জানালো, তারা সুদূর কেন'আন থেকে এসেছে এবং তাদের একজন বৈমাত্রেয় ভাই আছে । যে তাদের পিতার সাথে সেখানে রয়ে গিয়েছে । তিনি তাদের প্রতি এই অনুকম্পা দেখালেন যে, তার ভৃত্যদের কে বলে দিলেন তারা যেন তার ভাইদের পণ্য মূল্য তাদের মালপত্রের মধ্যে ফেরত রেখে দেয় । তিনি ভেবেছিলেন, তারা নিজেদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার পর হয়তো তারা এই অনুগ্রহের কারণে পুনরায় ফিরে আসবে । ইউসুফ আ: তাদের বললেন, আগামী সময় তোমরা যখন আসবে, তখন তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো । আমি কি তোমাদের যা যা প্রয়োজন ছিল তা দিয়ে সাহায্য করিনি ? তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসো, তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য আর কোনো রসদ থাকবে না । অর্থাৎ তোমাদের সাথে আর কোন লেনদেন করা হবে না । মূলত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভাই বিনইয়ামিনের সাথে সাক্ষাৎ করা । তারা বলল, আমরা তার বিষয়ে আমাদের পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব যাতে তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন ।

তারপর তারা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে তাদের দেশে ফিরে গেল । দেশে ফিরেই তারা তাদের পিতার কাছে এসে বলল, বাবা! আপনি বিনইয়ামিনকে আমাদের সাথে পাঠান । পরেরবার যদি আমরা তাকে আমাদের সাথে না নিয়ে যেতে পারি তবে আমাদেরকে খাদ্য দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে । আপনি নিশ্চিত থাকুন আমরা তার পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করবো । তাদের পিতা ইয়াকুব আ: বললেন, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের উপর সেই রকম নির্ভর করব যেরকম নির্ভর ইতঃপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম ? যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো, তখন দেখলো তাদের পণ্যমূল্যও ফেরত দেওয়া হয়েছে । তারা তাদের পিতাকে বলল, বাবা! আমাদের আর কি চাই ? এই যে আমাদের পণ্য মূল্যও আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং এবার আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য আরও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসবো আমাদের ভাইকে হেফাজত করবো এবং অতিরিক্ত এক উটের বোঝাও নিয়ে আসব । কিন্তু ইয়াকুব আ: তাদের কথায় কিছুতেই রাজি হলেন না । তিনি বললেন, আমি তাকে তোমাদের সঙ্গে কিছুতেই পাঠাবো না । যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে । তবে হ্যাঁ যদি তোমাদেরকে আক্রমণ করা হয়

সেটা ভিন্ন কথা । শেষ পর্যন্ত তারা তাদের পিতাকে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলল, আমরা যা বলছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক । ইয়াকুব আ: তাদের আরো উপদেশ দিলেন যে, হে আমার পুত্রগণ তোমরা যখন মিসরের নগরে প্রবেশ করবে তখন সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে । তাঁর এ পরামর্শ ছিল পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা হ'তে উৎসারিত। তিনি ভেবেছিলেন যে, একই পিতার সন্তান সুন্দর ও সুঠামদেহী ১১ জন ভিনদেশীকে একত্রে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলে তাদের প্রতি অন্যদের বদনজর লাগতে পারে। এটা শুধু আমার উপদেশ মাত্র। আল্লাহ যদি তোমাদের উপর কোন বালা মুসিবত লিখে রাখেন, তবে তা হতে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না । আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম কার্যকর হয় না সুতরাং আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি ।

অতঃপর তারা তাদের পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, তাঁর আদেশ মত সকলে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে নগরে প্রবেশ করলো এবং ইউসুফ আ: এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল । তিনি তাঁর ভাই বিনইয়ামিন এর সাথে আলাদাভাবে দেখা করার সুযোগ পেলেন । তখন তার কাছে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করলেন । তাকে বললেন, "আমি তোমার ভাই ইউসুফ । দেখো আমাদের ভাইয়েরা যা করেছে, তার জন্য দুঃখ করো না ।" অতঃপর তিনি বিনইয়ামিনকে তার কাছে রেখে দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করলেন । ইউসুফ আ: যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন বাদশাহ-এর পানি পান করার পেয়ালা বিনইয়ামিনের মালপত্রের মধ্যে রেখে দিলেন । লেনদেন শেষে তার ভাইয়েরা ফিরে যাওয়ার সময় একজন ঘোষক চিৎকার করে বলল, "ওহে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর ।" তারা তাদের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি হারিয়েছ?" তারা বলল, "আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না । যে ব্যক্তি সেটি এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মালামাল পুরস্কার পাবে । আমি নিজে তার পুরস্কার প্রাপ্তির জামিন ।" তারা বলল, "আল্লাহর কসম আপনারা জানেন আমরা দেশের ফাসাদ বিস্তার করার জন্য আসিনি এবং আমরা চোরও নই ।" তারা বললো, "তোমরা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তবে তার শাস্তি কী হবে?" তারা বলল, "তার শাস্তি এই যে যার মালপত্রের মধ্যে সেই পেয়ালাটি পাওয়া যাবে শাস্তিস্বরূপ তোমরা তাকেই রেখে দিবে । যারা জুলুম করে, আমরা তাদেরকে এরকমই শাস্তি দিয়ে থাকি ।" অতঃপর (ইউসুফ আ: এর নির্দেশ মোতাবেক) তার ভাইয়ের থলি তল্লাশির পূর্বে (ঘোষক) অন্য ভাইদের বস্তা তল্লাশি শুরু করল। তারপর সেই পেয়ালাটি তার (সহোদর) ভাইয়ের থলি থেকে বের করে আনলো। আল্লাহ বলেন,

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَّشَآءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ-(٧٦)

এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম । আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে বাদশাহর আইন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না । আমি যাকে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা উঁচু করি । আর যত জ্ঞানী আছে তাদের সকলের উপর আছেন একজন সর্বজ্ঞানী ।(সূরা ইউসুফ:৭৬)
তার ভাইয়েরা তাদের সম্মান রক্ষায় বলল, "যদি সে চুরি করেও থাকে তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই । কারণ এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিল ।" ইউসুফ আ: নিজের প্রতি এমন মিথ্যা অপবাদ শুনেও কোন প্রতিবাদ করলেন না । তিনি মনে মনে বললেন, "তোমরা আমার প্রতি যে অপবাদ লাগাচ্ছ সে ব্যাপারে তোমরা তো ঢের বেশি মন্দ আর তোমরা যা বলছো, তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত ।" এবার তারা বলতে লাগলো, "হে আযীয! এর অতিশয় বৃদ্ধ এক পিতা আছেন । কাজেই তার পরিবর্তে আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার কাছে রেখে দিন । আমরা আপনাকে একজন সদয় আচরণকারী মনে করি ।" ইউসুফ আ: বললেন, "এই বে-ইনসাফি থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি । যে ব্যক্তির কাছে আমাদের মাল পাওয়া গেছে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাকড়াও করব ! আমরা যদি এমন করি তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা জালিম হয়ে যাব ।"

তারা যখন ইউসুফ আ: এর উত্তর পেয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেল, তখন নিজে গিয়ে চুপিসারে পরামর্শ করতে লাগল । তাদের মধ্যে যে ভাই সকলের বড় ছিল সে বলল, "তোমাদের কি জানা নেই তোমাদের পিতা আমাদের থেকে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যা যা করেছিলে তাও তোমাদের জানা আছে । সুতরাং আমি এই দেশ ত্যাগ করতে পারব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহই আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা করে দেন । তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী । তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, বাবা! আপনার পুত্র চুরি করেছিল । আর আমরা যতটুকু জেনেছি ততটুকুই বর্ণনা করছি । আমরা যে জনপদে ছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং আমরা যে যাত্রী দলের সাথে এসেছি তাদের থেকে যাচাই করে নিন । নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী ।"

✐ ইউসুফ আ: এর আত্মপ্রকাশ...

বড় ভাইয়ের কথা মত তারা দেশে ফিরে তাদের পিতাকে সব ঘটনা খুলে বলল । এসব শুনে ইয়াকুব আ: বললেন, "এ হতে পারে না বরং তোমাদের মন নিজের তরফ থেকে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে । সুতরাং আমার পক্ষে সবরই শ্রেয় । হয়তো আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।" এ কথা বলে তিনি তাদের থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, “হায় আমার ইউসুফ!” ইউসুফ আঃ এর জন্য তিনি এত পরিমাণে কেঁদেছিলেন যে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । তার পুত্রগণ বলতে লাগলো, “আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফ কে ভুলবেন না যতক্ষণ না আপনি সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হবেন কিংবা মারাই যাবেন ।” ইয়াকুব আ: বললেন, “আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ কেবল আল্লাহরই কাছে করছি । আর আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তোমরা জানো না । হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না । জেনে রেখো, আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের ।” অতঃপর তারা অনুসন্ধান চালানোর জন্য আবারও মিসরে ইউসুফ আ: এর কাছে গেল এবং তাঁকে বলল, “হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কঠিন মুসিবতে আক্রান্ত হয়েছি । আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি । আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ রসদ দান করুন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন । নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্যে অনুগ্রহকারীদেরকে মহাপুরুষ্কার দিয়ে থাকেন ।”

তখন ইউসুফ আ: আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না । তিনি বলে উঠলেন, “তোমাদের কি মনে আছে তোমরা যখন জাহেল ছিলে তখন ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছিলে ? তাঁর এর মুখ থেকে একথা শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল । তারা ভাবতে লাগলো, যে কথা তারা ব্যতীত আর কেউ জানে না, তা তিনি কিভাবে জানতে পারলেন ? তারা বলে উঠলো, “তবে কি তুমিই ইউসুফ ?” ইউসুফ আ: বললেন, “আমিই ইউসুফ এবং (বিনইয়ামিনের দিকে ইশারা করে বললেন) এই আমার ভাই । আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন । প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তার প্রতিদান নষ্ট করেন না ।” তারা বলল, “আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম ।” ইউসুফ আ: বললেন, “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই । আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন । তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষার শ্রেষ্ঠ দয়ালু ।” এরপর তিনি তাঁর একটি পোশাক বের করে তাদেরকে দিয়ে বললেন, “আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দিও । এর ফলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে । আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো ।”

যখন তারা মিসর থেকে কেন'আনের দিকে রওনা হল, তখন থেকেই কেন'আনে বসেই তাদের পিতা ইয়াকুব আ: সবাইকে বলতে লাগলেন, 'আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি । তোমরা আমাকে যতই বলো না কেনো যে, বুড়ো বয়সে আমি উলট পালট বকছি ।” কিন্তু তার পরিবারের লোকেরা বলতে লাগল, “আল্লাহর কসম! আপনি এখনও পর্যন্ত আপনার পুরনো ভুল ধারণার মধ্যেই আছেন ।” তারপর একসময় কাফেলা এসে কেন'আনে পৌঁছালো । ইয়াকুব আ: এর

ছেলেরা ইউসুফ আ: এর সেই জামা তাঁর চেহারার উপর ফেলে দিল । অমনি তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন । এবং তারা সব ঘটনা তাঁকে খুলে বলল । তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলিনি আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি তোমরা জানো না?" তারা বলল, "বাবা! আপনি আমাদের পাপ রাশির ক্ষমার জন্য দু'আ করুন আমার নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী ছিলাম ।" তিনি বললেন, "আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য দু'আ করব । নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।"

✍ ইয়াকুব-পরিবারের মিসর গমন ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন...

এসব ঘটনার পর তারা সকলে পুনরায় মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল । এবারে তাদের সাথে ছিলেন তাদের পিতা ইয়াকুব আ: ও তাঁর স্ত্রী । অবশেষে তারা সকলে যখন ইউসুফ আ: এর কাছে উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাঁর পিতামাতাকে তাঁর সিংহাসনে বসালেন । তারপর তারা সকলে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে গেল । (উল্লেখ্য, এটা ইবাদতমূলক সিজদা ছিল না বরং এটা ছিল শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক সিজদা এবং এরূপ সিজদা ইউসুফ আ: এর শরীয়তে জায়েজ ছিল ।) ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন তাঁর পিতাকে বললেন, "বাবা! এই হল আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা । যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিণত করেছেন । তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে দেহাত থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন অথচ এত পূর্বে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তান অনর্থ সৃষ্টি করেছিল । বস্তুত আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্য অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করেন । নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ (١٠١)

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজত্বেও অংশ দিয়েছো এবং দান করেছো স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান । হে আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক । তুমি দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিও, যখন আমি থাকি তোমার অনুগত । আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো ।"(সূরা ইউসুফ:১০১)

✍ ইউসুফ আ: এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব...

ইউসুফ আ: আল্লাহর একজন নবী এবং কুরআনে বর্ণিত একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন এবং চরিত্র ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত । প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য ও ধৈর্যের এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সমগ্র মুসলিম উম্মাহের জন্য দিকনির্দেশনা ও শিক্ষার উৎস। পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসুফ-এ তাঁর জীবনের বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা "আহসানুল কাসাস" বা সবচেয়ে সুন্দর গল্প হিসেবে পরিচিত। এটি কেবল একটি কাহিনি নয়, বরং ইমান, ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল এবং ক্ষমার বাস্তব উদাহরণ। আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আ: কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর ব্যক্তি। তাঁর চেহারার সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক নয়, বরং চরিত্র ও আচরণেও তা প্রতিফলিত হয়েছিল। ইউসুফ (আ:) তাঁর জীবনে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি ভাইদের ষড়যন্ত্র, কূপে নিক্ষেপ, দাসত্ব এবং মিথ্যা অভিযোগ সহ অনেক কষ্ট সয়ে ধৈর্য ধারণ করেন। যুলায়খার প্রলোভন থেকে বেঁচে থাকা তাঁর তাকওয়া এবং আত্মসংযমের নিদর্শন । তাঁর মধ্যে ক্ষমা করার এক অনন্য মহত্ত্ব লক্ষ্যণীয়। তিনি তাঁর ভাইদের ক্ষমা করে দেন, যারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং কূপে ফেলে দিয়েছিল।
তাঁর মধ্যে দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বগুণের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় । তিনি মিসরের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি আল্লাহর দানকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা জাতিকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল।
ইউসুফ (আ:) আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার বিশেষ জ্ঞান পেয়েছিলেন। এই গুণের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেছিলেন, যা তাঁর নবুওয়্যতের অন্যতম নিদর্শন।

ইউসুফ আ: এর জীবন কেবল একজন নবীর জীবন নয়, বরং এটি একটি অনুপ্রেরণার গল্প। তাঁর জীবনের ঘটনা ধৈর্য, তাকওয়া, ক্ষমা, আত্মসংযম, এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে। তাঁর জীবনীতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং প্রতিকূল অবস্থায় সঠিক পথে থাকার জন্য দিকনির্দেশনা রয়েছে।

☞ রেফারেন্স:

১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮৯; হাকেম ২/৩৭৬ হা/৩৩২০, হাকেম একে ‘ছহীহ’ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।
২. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৬।
৩. তাফসীরে কুরতুবী, ইউসুফ ৫৫।
৪. সূরা ইউসুফ

হযরত আইয়ুব আ:

✍ আইয়ুব আ: এর পরিচয়...

হযরত আইয়ুব আ: ছিলেন অত্যন্ত সবরকারী নবীগণের মধ্যে অন্যতম । তিনি ছিলেন একজন মহান নবী, যাঁর ধৈর্য ও ঈমান ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত । ইবন কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি ছিলেন ঈস ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আ: এর বংশধর । আবার তাঁর স্ত্রীর নামের ব্যাপারেও বিভিন্ন মত পাওয়া যায় । কারো মতে তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল "লাইয়া" আবার কারো মতে তাঁর নাম ছিল "রুহমাহ বা রাহমাহ" । তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ আইয়ুব আ: এর জনপদের নাম বলেছেন 'হূরান' অঞ্চলের 'বাছানিয়াহ' এলাকা। যা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামেস্ক ও আযরূ'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।**(১)**

পবিত্র কুরআনে ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে আইয়ূব আ:-এর কথা এসেছে। যথা- সূরা নিসা **১৬৩**, আন'আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।

✍ ধনসম্পদ ও সম্মান...

আইয়ুব আ: ছিলেন অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী এবং সকলে নিকট সম্মানিত । জমিজমা ক্ষেত খামার গবাদি পশু ইত্যাদি সেকালে ধন সম্পদ বলতে যা বোঝাতো সবকিছুই তার ছিল । তাঁর স্ত্রীর সাথে ছিল তাঁর অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে তাঁদের অধিক সন্তানের নিয়ামতও দান করেছিলেন । আল্লাহ তায়ালার এত নিয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও তিনি কখনো দম্ভ করেননি । বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর শোকরগোজারী একজন বান্দা ।

✍ আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও আইয়ুব আ: এর সবর...

আইয়ুব আ: এর জীবনের এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন । তাকে প্রথম যে পরীক্ষায় ফেললেন তা ছিল ধন-সম্পদের পরীক্ষা । তার যে অঢেল ধন-সম্পদ ছিল আল্লাহ তাআলা তাঁর থেকে সেসব কিছু ছিনিয়ে নিলেন । তবুও তিনি নিরাশ হলেন না । তিনি আল্লাহর উপর উত্তমরূপে সবর করলেন । এরপর একসময় আল্লাহ তাআলা

তাঁর সকল সন্তানদেরকেও তার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন । যা তাঁর জন্য ছিল আরেকটি বড় শোকের ব্যাপার । তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর রবের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেন এবং ধৈর্য্য ধারণ করে গেলেন।

ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি হারিয়ে এবার তিনি আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন । তিনি এক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলেন । সম্ভবত আইয়ুব আ: কোন কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর সে রোগবালাই এর কারনে সমাজের সকলেই তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো । তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থার পুরোটা সময় জুড়েই শুধু একজনই তাঁর পাশে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সহায়তা করে গিয়েছিলেন। এবং তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী । তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রী ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যগণ এক এক করে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল । দীর্ঘ সময় ধরে আইয়ুব আ: সে কঠিন রোগে ভুগেছিলেন । কিন্তু তিনি ঠিক কতদিন রোগে ভুগছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে ।

✎ দুআ কবুল ও আরোগ্য লাভ...

দীর্ঘদিন রোগযন্ত্রণায় ভোগার পরও তিনি পরম ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করেন । আল্লাহ তাআলা তাঁর দু'আ কবুল করে নেন । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়ায় বলেছেন,

وَ اَيُّوۡبَ اِذۡ نَادٰی رَبَّہٗۤ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ ﴿ۚ۸۳﴾ فَاسۡتَجَبۡنَا لَہٗ فَکَشَفۡنَا مَا بِہٖ مِنۡ ضُرٍّ وَّ اٰتَیۡنٰہُ اَہۡلَہٗ وَ مِثۡلَہُمۡ مَّعَہُمۡ رَحۡمَۃً مِّنۡ عِنۡدِنَا وَ ذِکۡرٰی لِلۡعٰبِدِیۡنَ ﴿۸۴﴾

"এবং আইয়ুবকে দেখো, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার প্রতিপালক ! আমার এই কষ্ট দেখা দিয়েছে এবং তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং সে যে কষ্টে আক্রান্ত ছিল তা দূর করে দিলাম । আর তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সমপরিমাণ আরো । যাতে আমার পক্ষ হতে রহমতের প্রকাশ ঘটে এবং ইবাদতকারীদের লাভ হয় স্মরণীয় শিক্ষা ।" (সূরা আম্বিয়া:৮৩-৮৪)

তাঁর আরোগ্য লাভের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

وَ اذۡکُرۡ عَبۡدَنَاۤ اَیُّوۡبَ ۘ اِذۡ نَادٰی رَبَّہٗۤ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الشَّیۡطٰنُ بِنُصۡبٍ وَّ عَذَابٍ ﴿ؕ۴۱﴾ اُرۡکُضۡ بِرِجۡلِکَ ۚ ہٰذَا مُغۡتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ﴿۴۲﴾ وَ وَہَبۡنَا لَہٗۤ اَہۡلَہٗ وَ مِثۡلَہُمۡ مَّعَہُمۡ رَحۡمَۃً مِّنَّا وَ ذِکۡرٰی لِاُولِی الۡاَلۡبَابِ ﴿۴۳﴾

"আমার বান্দা আইয়ুব কে স্মরণ করো, যখন সে নিজ প্রতিপালক কে ডেকে বলেছিল, শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্টে জড়িয়েছে । আমি তাকে বললাম তুমি তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর । নাও, এইতো গোসলের ঠাণ্ডা পানি এবং পানীয় । এবং আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে অনুরূপ আরো-তার প্রতি আমার রহমত এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।"(সূরা সোয়াদ: ৪১-৪৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে বললেন । অতঃপর তিনি যখন তার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন ওমনি সেখান থেকে একটি প্রস্রবণ উৎসারিত হলো । আল্লাহ তাআলা তাকে সেই পানি দ্বারা গোসল করতে ও তা পান করতে হুকুম করলেন । তিনি তাই করলেন । ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন । আরোগ্য লাভের পর আল্লাহ তায়ালা একে একে তাঁর সবকিছু ফিরিয়ে দিলেন । তাঁর আগে যা ধন-সম্পদ ছিল তা দ্বিগুণ আকারে তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তাঁর আগে যত সন্তান ছিল তার থেকে আরও বেশি সন্তান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করলেন ।

✎ আইয়ুব আ: এর শপথ পূরণ...

আইয়ুব আ: এর অসুস্থতার সময়, একবার শয়তান তাঁর স্ত্রীর কাছে এক চিকিৎসকের বেশে আসলো । স্বামী রুগ্নাবস্থার কারণে তিনি খুবই পেরেশান ছিলেন । কাজেই তিনি সহজেই শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গেলেন । তিনি শয়তানকে চিকিৎসক মনে করে বললেন, আমার স্বামীর চিকিৎসা করুন । শয়তান বলল, চিকিৎসা করতে রাজি আছি । তবে শর্ত হলো, আরোগ্য লাভের পর তোমাকে বলতে হবে, এই চিকিৎসকই তাকে ভালো করে দিয়েছে । তিনি যেহেতু স্বামীর অসুস্থতার কারণে পেরেশান ছিলেন, তাই তার কথা মানার প্রতি তার মনে ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছিল । তিনি তিনি বিষয়টা আইয়ুব আলাইহিস সালামকে জানালে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন । তাঁর মনে আক্ষেপ জাগলো যে, শয়তান তাঁর স্ত্রীর কাছেও পৌঁছে গেল এবং এমনকি স্ত্রীর মনে তার কথা মানার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে! এমন অবস্থায় তিনি কসম খেয়ে ফেললেন যে, আরোগ্য লাভের পর আমি স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করব । কিন্তু তিনি যখন আরোগ্য লাভ করলেন, তখন এই কসমের জন্য তাঁর খুব অনুশোচনা হলো । তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এরকম অসাধারণ বিশ্বস্ত স্ত্রীকে তিনি কিভাবে শাস্তি দিবেন? আর যদি শাস্তি না দেন তবে তো কসম ভেঙে যাবে! তাঁর এরকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করলেন । ওহির মাধ্যমে তাঁকে আল্লাহ তাআলা এর সমাধান বলে দিলেন । এ সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَ خُذۡ بِیَدِکَ ضِغۡثًا فَاضۡرِبۡ بِّہٖ وَ لَا تَحۡنَثۡ ؕ اِنَّا وَجَدۡنٰہُ صَابِرًا ؕ نِعۡمَ الۡعَبۡدُ ؕ اِنَّہٗۤ اَوَّابٌ ﴿۴۴﴾

"তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ নাও এবং তা দ্বারা আঘাত করো আর শপথ ভঙ্গ করো না । বস্তুত আমি তাকে পেয়েছি একজন সবরকারী । সে ছিল অতি উত্তম বান্দা প্রকৃতপক্ষে এসেছিল অত্যন্ত আল্লাহ অভিমুখী ।"(সূরা সোয়াদ:৪৪)

অর্থাৎ তিনি যেন একশো তৃণের একটি মুঠো নিয়ে তা দ্বারা তাঁর স্ত্রীকে মাত্র একবার আঘাত করেন । এ পন্থায় তাঁর কসম রক্ষা করা হবে আবার স্ত্রীও তাতে বিশেষ কষ্ট পাবে না ।

✍ হাদিসে বর্ণিত আইয়ুব আ: এর একটি ঘটনা...

আবূ হুরাইরাহ রা: হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা আইয়ুব আ: নগ্ন শরীরে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, "হে আইয়ুব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে মুখাপেক্ষীহীন নই।" **(২)**

✍ আইয়ুব আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

আল্লাহর একজন নবী হিসেবে আইয়ুব আলাইহিস সাল্লাম এর সবর ছিলো অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের । অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত ও শোকরজারী বান্দা । আল্লাহ তাআলা তার জীবদ্দশায় তাকে একের পর এক বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন । ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দীর্ঘকালীন রোগ ব্যাধির মতো কঠিন পরীক্ষার মধ্যেও তিনি আল্লাহর প্রতি সবর ও তাওয়াক্কুল করেছেন । এভাবে তিনি তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন ।

তাঁর জীবন থেকে শিক্ষণীয়: কারো জীবনে খারাপ কিছু হওয়া মানেই এই নয় যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিচ্ছেন বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরও পরীক্ষা করে থাকেন । যেমনটি আইয়ুব আ:-কে করেছিলেন । এবং সেই পরীক্ষার মাধ্যমে তারা আল্লাহর আরো প্রিয় হয়ে ওঠেন । প্রকৃত সবরকারীর জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আইয়ুব দম্পতি ছিলেন

তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আইয়ুব আ: এর স্ত্রী ছিলেন বিশ্বের পুণ্যবতী মহিলাদের শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত । অসুস্থতাকালে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন ।
এত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব আ: কখনো আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেননি বরং তিনি আল্লাহর প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ।

☞ রেফারেন্স:

১.ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১/২০৬-১০ পৃঃ; কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১।
২. সহীহ বুখারী - পরিচ্ছেদ ৬০/২০, হাদীস নং ৩৩৯১

হযরত শুয়াইব আ:

শুয়াইব আ: এর পরিচয়...

হযরত শুয়াইব আ: প্রেরিত হয়েছিলেন মাদইয়ানবাসীর প্রতি । মাদইয়ান হল লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে এবং আরব দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। তিনি ছিলেন ইব্রাহিম আ: এর বংশধর । আত তাবারির মতে, মাদইয়ান ছিল ইব্রাহিম আ: এর একজন বংশধরের নাম । যার নামে সেই পুরো গোত্রের নামকরণ করা হয় । ইবনে কাসির বলেন, মাদইয়ান ছিল একটি আরব জাতির নাম এবং তাদের নামে তাদের শহরের নামকরণ করা হয় । যা মা'আন শহরের কাছে অবস্থিত ছিল । কওমে লূত-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন ।(সূরা হূদ ১১:৮৯) চমৎকার বাগ্মিতার কারণে তিনি (خطيب الأنبياء) 'খত্বীবুল আম্বিয়া' (নবীগণের মধ্যে সেরা বক্তা) নামে খ্যাত ছিলেন। **(১)** ইবনে ইসহাক রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সা: যখনই হযরত শুয়াইব আ:-এর নাম উল্লেখ করতেন তখনই তিনি বলতেন, "তিনি ছিলেন 'খতীবুল আম্বিয়া' ।" কেননা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমান গ্রহণের জন্য যে দাওয়াত পেশ করেন, তাঁর শব্দ ও ভাষা ছিল অতি উচ্চাঙ্গের এবং বক্তব্য ও উপস্থাপনা ছিল অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ।

সহীহ্ ইবনে হিব্বান গ্রন্থে, আম্বিয়া ও রাসুলগণের বিবরণ অধ্যায় এ হযরত আবু যর রা:-এর বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে । রাসূল সা: বলেন, নবীদের মধ্যে চারজন নবী আরবের । যথা- হুদ, সালেহ্, শুয়াইব ও তোমাদের নবী । অর্থাৎ রাসূল সা: নিজে ।

মাদইয়ানবাসীর বা আইকাবাসীর সামাজিক অবস্থা...

আহলে মাদইয়ান-কে পবিত্র কুরআনে কোথাও কোথাও 'আসহাবুল আইকাহ' (اصحاب الأيكة) বলা হয়েছে। আইকা অর্থ নিবিড় বন। শুয়াইব আ:-কে যে সম্প্রদায়ের কাছে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, তারা এরকম বনের পাশেই বাস করত। কোন কোন মুফাসসির বলেন এই জনপদেরই নাম ছিল মাদইয়ান । কারো মতে আইকা ও মাদইয়ান এক নয়; বরং স্বতন্ত্র দুটি জনপদ । হযরত শুয়াইব আ: উভয়ের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন । তাফসিরকারকগণের মধ্যে, হাফেজ ইবনে কাসির এর ধারণা, এ বসতিতে আইকা নামের একটি বৃক্ষ ছিল । গোত্রের

লোকেরা যেহেতু উক্ত বৃক্ষের পূজা করত, এ কারণেই মাদইয়ান গোত্রকেই আসহাবে আইকা বলা হয়েছে ।

মাদইয়ান ছিল একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা । মাদইয়ানের ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল । সেখানকার লোকজন সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী ছিল । কিন্তু কালক্রমে তাদের মাঝে কুফর ও শিরকসহ বহু দুষ্কর্ম চালু হয়ে যায় । তাদের মাঝে ওজনে ও মাপে কম দিয়ে প্রতারণা করার অভ্যাস ছিল । তারা লেনদেনের সময় লোক ঠকাত । তারা পথচারীদের থেকে জোরপূর্বক টোল বা কর আদায় করত । রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে পথিকদের মালামাল লুট করত । অর্থাৎ তারা ডাকাতি, ছিনতাই ও লুটতরাজ ইত্যাদির সাথে জড়িত ছিল । এছাড়াও তারা মানুষের মালিকানাধীন সম্পদ ছিনিয়ে নিত । এভাবে তারা বিভিন্নভাবে মানুষের হক্ক নষ্ট করত ।
ইবনে আব্বাস রা: বলেন, যদি কেউ শুয়াইব আ:-এর কথা শোনার জন্য তাঁর ঘরে যেতে চাইত তখন তারা তাদেরকে বাধা দিত ও তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করতো।

মাদইয়ানবাসীর প্রতি শুয়াইব আ: এর দাওয়াত...

মাদইয়ানবাসীর এতসব দুষ্কর্মের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্প্রদায়ের থেকেই শুয়াইব আ:-কে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন । তিনি বিভিন্ন পন্থায় তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বক্তৃতা-বিবৃতির বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন, এ কারণেই তাঁকে খতীবুল আম্বিয়া বলা হত । নিজ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি তাওহীদের যে দাওয়াত পেশ করেন ও তাদের অসৎকর্ম হতে বিরত থাকার যে উপদেশ প্রদান করেন তা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

وَ اِلٰی مَدۡیَنَ اَخَاہُمۡ شُعَیۡبًا ؕ قَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرُہٗ ؕ قَدۡ جَآءَتۡکُمۡ بَیِّنَۃٌ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ فَاَوۡفُوا الۡکَیۡلَ وَ الۡمِیۡزَانَ وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡیَآءَہُمۡ وَ لَا تُفۡسِدُوۡا فِی الۡاَرۡضِ بَعۡدَ اِصۡلَاحِہَا ؕ ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿ۚ۸۵﴾ وَ لَا تَقۡعُدُوۡا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوۡعِدُوۡنَ وَ تَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ مَنۡ اٰمَنَ بِہٖ وَ تَبۡغُوۡنَہَا عِوَجًا ۚ وَ اذۡکُرُوۡۤا اِذۡ کُنۡتُمۡ قَلِیۡلًا فَکَثَّرَکُمۡ ۪ وَ انۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُفۡسِدِیۡنَ ﴿۸۶﴾

“আর মাদইয়ানবাসীর কাছে তাদের ভাই শুয়াইব কে (পাঠালাম) । সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই । তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে । সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে ও মানুষের মালিকানাধীন বস্তুসমূহে তাদের অধিকার খর্ব করবে না । আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না । এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর

পথ- যদি তোমরা মুমিন হও । আর আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য, আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিতে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে তোমরা প্রতিটি পথে বসে থেকো না। আর স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর।"(সূরা আরাফ:৮৫-৮৬)

সূরা শুআরা তেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দাওয়াতের বিষয় উল্লেখ করে বলেন,

اِذۡ قَالَ لَہُمۡ شُعَیۡبٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۷۷﴾ اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ﴿۱۷۸﴾ فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۷۹﴾ وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡہِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۸۰﴾ اَوۡفُوا الۡکَیۡلَ وَ لَا تَکُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُخۡسِرِیۡنَ ﴿۱۸۱﴾ وَ زِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِیۡمِ ﴿۱۸۲﴾ وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡیَآءَہُمۡ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِیۡنَ ﴿۱۸۳﴾ وَ اتَّقُوا الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ وَ الۡجِبِلَّۃَ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۱۸۴﴾

"যখন শুয়াইব তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসুল । সুতরাং আল্লাহকে ভয় করে এবং আমার কথা মানো । আমি এই কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না । আমার প্রতিদান তো জগৎসমূহের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন । তোমরা বাপের পুরোপুরি দিও । যারা মাপে ঘাটতি করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না । ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। মানুষকে তাদের মালামাল কমিয়ে দিও না এবং জমিনে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িও না । এবং সেই সত্যকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম কেও।"(সূরা শুআরা:১৭৭-১৮৪)

তিনি যখন তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে বললেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদারগণ বলল, "হে শুয়াইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব । অন্যথায় তোমাদের সকলকে অবশ্যই আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে ।" শুয়াইব আ: বললেন, "আমরা যদি তোমাদের দ্বীনকে ঘৃণা করি তবুও কি?"(সূরা আরাফ:৮৮) (উল্লেখ্য, শুয়াইব আ: কখনো তাদের ধর্মে ছিলেন না । নবুওয়াতের আগে তাঁর কওমের লোক মনে করত তিনি তাদের ধর্মের অনুসারী তাই তারা তাঁকেও ফিরে আসতে বলেছিল)

শুয়াইব আ: আরোও বললেন, "আমরা যদি তোমাদের দ্বীনে ফিরে যাই, যখন আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি অতি বড় মিথ্যারোপ করবো । বস্তুত তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়- হ্যাঁ আমাদের প্রতিপালক

আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেটা ভিন্ন কথা । আমাদের প্রতিপালক নিজ জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে আছেন । আমরা আল্লাহরই প্রতি নির্ভর করেছি । হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফায়সালা করে দিন । আপনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ।"(সূরা আরাফ:৮৯) অতঃপর তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদারগণ তখনও কুফরকেই ধরে রেখেছিল, তারা তাদের সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদেরকে বলতে লাগলো, তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ করো, তবে মনে রেখো তোমরা তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

তিনি আরো বললেন, তোমরা যদি আমার কথা মানো তবে মানুষের ন্যায্য হক আদায় করার পর আল্লাহ প্রদত্ত যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তোমাদের পক্ষে তাই শ্রেয় । আর যদি না মানো তবে আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত হইনি ।(সূরা হুদ:৮৬)

কিন্তু তাঁর কওমের উপর তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়লো না । বরং তারা নবীর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বলল, "হে শুয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করব এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের যা ইচ্ছা হয় তা করবো না? তুমি তো মনে হয় বড় বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক!"(সূরা হুদ:৮৭)

অর্থাৎ তাদের মানসিকতা এরূপ ছিল যে, আমার হস্তগত সম্পদে আমার একচ্ছত্র অধিকার । কাজেই তাতে আমার যা ইচ্ছা তাই করার এখতিয়ার রয়েছে । এতে কারো বাধা দেওয়ার কোন হক নেই ।

কওমের লোকদের এসব বিদ্রূপবান ও রূঢ় মন্তব্য সমূহে বিচলিত না হয়ে অতীব ধৈর্য ও দরদের সাথে তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বলতো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিজক দান করে থাকেন তবে তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের মতো ভ্রান্ত পথে কেন চলব ? আমার চরিত্র এমন নয় যে, আমি যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তোমাদের পেছনে গিয়ে নিজেই তা করতে থাকবো । নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই । আর আমি যা কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই পারি । আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং তাঁরই দিকে প্রতিটি বিষয়ে রুজু হই।"(সূরা হুদ: ৮৮)

তিনি তাদেরকে নূহ, হুদ, লূত ও সালেহ্‌ আ: এর কওমের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, “হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতি হঠকারিতা তোমাদেরকে যেন এমন পরিণতিতে না পৌঁছায় যে, নূহের সম্প্রদায় বা হুদের সম্প্রদায় কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের ওপর যেমন মুসিবত অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমাদের উপরও সেরকম মুসিবত অবতীর্ণ হয়ে যায় । আর লূত এর সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশি দূরেও নয় । এবং তিনি তাদেরকে তাওবা করার উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো । তারপর তাঁরই দিকে রুজু হও নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।” তখন তারা বলল, “হে শুয়াইব! তোমার অনেক কথা তো আমাদের বুঝেই আসেনা। তোমাকে তো আমাদের মধ্যকার একজন দুর্বল ব্যক্তি বলে আমরা মনে করি । যদি তোমার জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা না থাকত, তাহ'লে এতদিন আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করে ফেলতাম। তুমি আমাদের উপরে মোটেই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি নও ।” তিনি বললেন, সে আমার সম্প্রদায় তোমাদের উপর কি আল্লাহ অপেক্ষা আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীই বেশি ক্ষমতাশালী? যে, তোমরা তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে পেছনে রেখে দিয়েছো ? জেনে রেখো, তোমরা যা কিছু করছ আমার প্রতিপালক তার সবই পরিপূর্ণভাবে বেষ্টন করে রেখেছেন । অতএব, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাকো আর আমি আমার পথে । শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হয় যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে । আর কে মিথ্যাবাদী? তোমরা অপেক্ষা করো আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি ।”(সূরা হুদ:৮৯-৯৩)

তারা তাঁর কোন উপদেশ তো শুনলোই না বরং আরো বলতে লাগল, “নিশ্চয়ই তোমার উপর কঠিন জাদু করা হয়েছে। তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষই । তোমার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এটাই যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী । তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আকাশের একটি খন্ড ফেলে দাও ।” শুয়াইব আ: বললেন, “তোমরা যে শাস্তির দাবি করছ তা আমার এখতিয়ারে নয়। কাকে কখন কি শাস্তি দেওয়া হবে সে ফায়সালা কেবল আল্লাহরই হাতে । আমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন তোমরা যা করছো ।”

✍ আল্লাহর শাস্তি...

হযরত শুআইব আ:-এর শত উপদেশ উপেক্ষা করে যখন কওমের নেতারা তাদের অন্যায় কর্মসমূহ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে অনড় রইল এবং নবীকে জনপদ থেকে বের করে দেবার ও হত্যা করার হুমকি দিল ও সর্বোপরি হঠকারিতা করে তারা আল্লাহর গযব প্রত্যক্ষ করতে চাইল, তখন তিনি বিষয়টি আল্লাহর উপরে সোপর্দ করলেন ।

অবশেষে তাই হল যা আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বিধানের ফয়সালা ও মীমাংসা । দলিল প্রমাণের আলো আসার পরেও যখন বাতিলের উপর হঠকারিতা করা হয় এবং দলিল প্রমাণের সত্যতা নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়, সত্যের প্রচারে ও অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তখন আল্লাহর আযাব সেই অপরাধী জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেয় ।

আল্লাহ্ তাআলা শুয়াইব আ: ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণকে উক্ত জনপদ হ'তে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন। শুয়াইব আ: তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার সময় এ কথা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম । কিন্তু যে সম্প্রদায় ছিল অকৃতজ্ঞ আমি তাদের জন্য কিভাবে আক্ষেপ করি!

তারপর এক প্রচন্ড নিনাদ এসে মাদইয়ানবাসীদের পাকড়াও করল । এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ- كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ-(٩٥-٩٤)

'অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি শো'আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন আপতিত হ'ল। ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল'। '(তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হ'ল) যেন তারা কখনোই সেখানে বসবাস করেনি। সাবধান! ছামূদ জাতির উপর অভিসম্পাতের ন্যায় মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত' (হূদ ১১: ৯৪-৯৫)।

আসহাবে মাদইয়ানের উপরে গযবের ব্যাপারে কুরআনে ظُلَّةٌ (শো'আরা ১৮৯), رَجْفَةٌ (হূদ ৯৪), صَيْحَةٌ (আ'রাফ ৮৮) তিন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ, ভূমিকম্প। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: এর একটি বর্ণনায় আছে, তাদের ওপর প্রথমে প্রচন্ড গরম পড়ে, যাতে অস্থির হয়ে তারা চিৎকার করতে থাকে । তারপর নগরের বাইরে মেঘ দেখা দেয় । সেখানে ঠান্ডা বাতাস বইছিল । তারা সবাই শহর ছেড়ে সেখানে গিয়ে জড়ো হয় । সহসা সেই মেঘ থেকে অগ্নি বর্ষণ শুরু হল । একেই মেঘাচ্ছন্ন দিবস ব্যক্ত করা হয়েছে । তারপর আসলো ভূমিকম্প । ভূমিকম্পের সাথে সাধারণত আওয়াজও থাকে তাই এই শাস্তিকে صَيْحَةٌ অর্থাৎ প্রচন্ড শব্দ বলা হয়েছে ।

🖊 শুয়াইব আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

হযরত শুয়াইব (আ:) ছিলেন আল্লাহর একজন প্রিয় নবী। তিনি মাদইয়ান অঞ্চলের মানুষকে সৎ পথে ডাকার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কুরআনে তার নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার বাণী ও কাজের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য অনুপ্রেরণা রয়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান, ধৈর্যশীল এবং সত্যের জন্য আপসহীন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষকে বোঝানোর দক্ষতা রাখতেন। তাঁর দাওয়াহ ছিল আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে এবং শিরক ও পাপ থেকে বাঁচতে উৎসাহিত করা।
শুয়াইব (আ:) তাঁর সম্প্রদায়কে ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। এই শিক্ষা সকলের জীবনে সততা এবং নৈতিকতার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে। তিনি মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং শিরক ত্যাগ করতে বলেন। তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধরে তার দাওয়াহ চালিয়ে যান। এটি শেখায় যে সত্যের পথে চলতে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অপরিহার্য। তিনি তাঁর কওমকে তাদের কর্মের পরিণাম হিসেবে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু মাদইয়ানের লোকেরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় কঠিন শাস্তি ভোগ করে । তাদের উপর নেমে আসা সেই শাস্তি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর সাথে শিরক করলে, তাঁর অবাধ্যতা করলে এবং বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব অবধারিত হয়ে যায় ।

মোটকথা, হযরত শুয়াইব আ: এর জীবনী আমাদের সততা, ধৈর্য, নৈতিকতা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা দেয়।

☞ রেফারেন্স:

১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৩।

হযরত মূসা আ: ও হযরত হারুন আ:

✍ মূসা আ: এর পরিচয়...

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তায়ালার অন্যতম মর্যাদাবান নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর আসমানী কিতাব 'তাওরাত' নাযিল করেন । তাঁর পিতার নাম ছিল ইমরান ও মাতার নাম ছিল 'ইউহানিব' । তবে তাঁর মাতার নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । তাঁর জন্ম হয় মিসরে এবং ফিরআউনের ঘরে তিনি লালিত-পালিত হন । তাঁর সহোদর ভাই হযরত হারুন আ: ছিলেন তাঁর থেকে তিন বছরের বড় । হারুন আ: ও পরবর্তীকালে নবী হন । ফিরআউনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণ আ: সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মূসা আ:-এর মু'জেযা সমূহ অন্যান্য নবীদের তুলনায় যেমন বেশী ছিল, তাঁর সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলীও ছিল বিগত উম্মতগুলির তুলনায় অধিক এবং চমকপ্রদ।

✍ মূসা আ: এর জন্ম...

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রা: এবং বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফিরআউন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ'তে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনী ইসরাইলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতি সত্বর বনী ইসরাইলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার হাতে আপনার রাজত্বের অবসান হবে'।**(১)**

এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সে ফরমান জারি করল, বনী ইসরাইলে যত শিশুর জন্ম হবে তাদের সকলকে হত্যা করা হোক, তবে মেয়ে শিশু ব্যতীত। কেননা বড় হলে তাদের থেকে সেবা নেওয়া যাবে । এভাবে বহু নবজাতক কে হত্যা করা হয় । সে বছরই হযরত মূসা আ: জন্মগ্রহণ করেন । নবজাতক সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশঙ্কায় তাঁর পিতা-মাতা ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাকে এলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, "তুমি এই শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো তারপর সিন্দুকটি দরিয়ায় ফেলে দাও । অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে

ঠেলে দেবে। অতঃপর আমার শত্রু ও তার শত্রু (ফিরআউন) তাকে উঠিয়ে নেবে ।" (সূরা ত্বহা:৩৭-৩৯) অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ-(٧)

"আমি মূসার মায়ের প্রতি ইলহাম করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাকো । যখন তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা বোধ করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও । আর ভয় পেয়ো না ও দুঃখ করো না । বিশ্বাস রেখো, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূলগণের মধ্যে হতে একজন রাসূল বানিয়ে দেব ।"(সূরা কাসাস: ৭)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালার ইলহাম অনুযায়ী ফিরআউনের সৈন্য কর্তৃক নিহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তাঁর পিতা-মাতা তাদের প্রিয় সন্তানকে একটি সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দিল। অতঃপর স্রোতের ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে সিন্দুকটি ফিরআউনের রাজপ্রাসাদের কাছে এসে ঠেকলো। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল । ফিরআউনের প্রাসাদে গিয়ে সিন্দুকটি যখন থেকে তখন তার কর্মচারীগণ সেটি তুলে কাল বিলম্ব না করে শিশুটিকে ফিরআউনের কাছে নিয়ে এলো । ফিরআউন শিশুটিকে বনী ইসরাইলের মনে করে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু সেখানে তার পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়াও উপস্থিত ছিলেন । শিশু মূসা আ: এর ফুটফুটে সুন্দর চেহারা দেখে তার মনে তাঁর জন্য মায়া ধরে গেল । তিনি তাঁকে পুত্র হিসেবে লালন পালন করার জন্য ফিরআউনকে উদ্বুদ্ধ করলেন । সন্তানহীনা স্ত্রীর শিশুটির প্রতি এমন অপত্য স্নেহ দেখে ফিরআউন নিজেও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো । আল্লাহ তাআলা মূসা আ: এর চেহারার ভেতর এমন আকর্ষণ দান করেছিলেন যে, যে কেউ তাঁকে দেখলে তাঁর মায়ায় পড়ে যেত। তাই ফিরআউনও তাঁকে নিজ প্রাসাদে রাখতে সম্মত হয়ে গেল । বস্তুত এটাও ছিল আল্লাহ তায়ালার মহাপরিকল্পনারই অংশ । ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফেরাঊনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- (القصص-٩)

"এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি'। আল্লাহ বলেন, 'অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না।" (সূরা কাসাস:৯)

এদিকে শিশু মূসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল । তিনি যখন জানতে পারলেন তার কলিজার টুকরা শিশু সন্তানটি শত্রুর হাতে গিয়ে পড়েছে তখন হেদায়েত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি প্রায় বলেই ফেলছিলেন যে, "এটি আমার বাচ্চা ।" কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সবর ও সংযম ঢেলে দিয়েছিলেন যার দরুন তিনি নিজেকে সামাল দিয়ে ফেলেন । ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া শিশু মূসাকে লালন পালন করা সিদ্ধান্ত নিলে তাঁকে দুধপান করানোর জন্য একজন ধাত্রী দরকার হল । সুতরাং তারা ধাত্রী খোঁজ করা শুরু করে দিলেন । কিন্তু মূসা আ: কোন ধাত্রী দুধই মুখে নিচ্ছিলেন না । এমন সময় মূসা আ: এর বোন তাঁর খোঁজে প্রাসাদ পর্যন্ত চলে আসেন । সেখানে পৌঁছে দেখেন তারা শিশুটিকে দুধ পান করানোর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না তখন তিনি সুযোগ বুঝে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেবো যারা তোমাদের পক্ষ হতে এই শিশুর লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তাঁর কল্যাণকামী ।"(সূরা কাসাস:১২) অতঃপর রানীর সম্মতিক্রমে শিশু মূসা আ: কে তাঁরই মায়ের নিকট তাঁর লালন-পালনের জন্য নিয়ে আসা হল । মূসা খুশী মনে মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ রহমতে তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী মূসা আ: কে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন। নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তানকে পুনরায় বুকে ফিরে পেয়ে তাদের হৃদয় শীতল হল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

"এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে এবং যাতে সে ভালোভাবে জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না ।"(সূরা কাসাস:১৩)

✎ মূসা আ:-এর যৌবনকাল...

ফিরআউনের ঘরে মা আসিয়ার লালন পালনে এবং তাঁর নিজ মায়ের লালন পালনে শৈশব কাটিয়ে মূসা আ: এক বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জ্ঞান ও হিকমাহ্ দান করলেন । আল্লাহ বলেন, "যখন মূসা বলবত্তায় উপনীত হলো ও হয়ে গেল পূর্ণ যুবক, তখন আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও ইলম। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি ।"(সূরা কাসাস:১৪) সেই সাথে তিনি শারীরিকভাবেও অত্যন্ত বলবান হয়ে উঠলেন ।

মূসা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। দেখলেন যে, পুরা মিসরীয় সমাজ ফিরআনের একচ্ছত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত। একজন প্রজ্ঞাবান তরুণ হিসেবে তিনি সমাজের অন্যায় অত্যাচারগুলো ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন। বনী ইসরাইলরা যে সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত ছিল তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ।

একদিন মূসা আ: নগরে বের হলেন । তিনি দেখলেন, ফিরআউনের দলের একজন লোক বনী ইসরাইলের একজনকে ভীষণ মারধর করছে । এবং বনি ইসরাইলের লোকটি ফিরআউনের দলের সেই লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্যের জন্য ডাকলো । তখন মূসা আ: তাকে বাঁচানোর জন্য ফিরআউনের সেই লোককে একটি ঘুষি মারল এবং সেই ঘুষিতে লোকটি মারা গেল। এই ঘটনার পরক্ষণেই মূসা আ: আক্ষেপ করে বললেন, এটা শয়তানের কান্ড। মূলত সে এক প্রকাশ্য শত্রু। যার কাজই ভুল পথে নিয়ে যাওয়া। যদিও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল লোকটির অত্যাচার থেকে বনী ইসরাইলের ব্যক্তিটিকে রক্ষা করা, তাকে হত্যা করার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু তারপরও হত্যা করা যেহেতু একটি গুরুতর পাপ তাই তিনি এ ঘটনায় খুবই অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজ সত্তার প্রতি জুলুম করেছি । আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। " তাঁর এই দুআ কবুল করে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি আরো বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই ভবিষ্যতে আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না ।"(সূরা কাসাস: ১৬-১৭)

এদিকে তাঁর এই হত্যার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পরল । কিবতি ব্যক্তিটির হত্যাকারী কে তা কেউ জানতো না । কারণ সেই ঘটনার সময় সেখানে কেউ ছিলো না । অতঃপর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হলো । পরের দিন সকাল বেলা ভীতাঅবস্থায় মূসা আ: নগরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বের হলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন গতকাল যে ব্যক্তি তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল সে ব্যক্তিই তাঁকে আবার সাহায্যের জন্য ডাকছে । মূসা আ: বুঝতে পারলেন এই লোকটিই আসলে দোষী । মূসা আ: তাকে বললেন, ঝগড়া-বিবাদ করা মনে হয় তোমার প্রাত্যহিক কাজ। গতকাল একজনের সাথে মারামারি করছিলে আবার আজ করছ অন্য একজনের সাথে । বোঝা গেল, তুমি এক প্রকাশ্য দুষ্ট লোক । লোকটি বুঝতে পারল যে আজ আর তাঁকে ধোকা দিয়ে সে সাহায্য তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না । অতঃপর ফিরআউনের লোকটিকে মূসা আ: যখন ধরতে উদ্ধত হলেন অর্থাৎ তাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ালেন, তখন বনী ইসরাইলের সেই ব্যক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, "হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, আজ কি তুমি আমাকেও সেভাবে

হত্যা করতে চাও? তোমার উদ্দেশ্য তো এ ছাড়া কিছুই নয় যে তুমি ভূমিতে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাও আর তুমি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও না।”

তাঁর এই কথা শুনে সকলে অবাক হয়ে গেল এবং জানতে পারল মূসা আ: ই ফিরআউনের লোকটিকে হত্যা করেছেন । খবরটি দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল । এরপর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলে তাঁকে হত্যা করা সিদ্ধান্ত নিল । নগরের দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি মূসা আ: এর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁর নিকট ছুটে এলো এবং বলল, হে মূসা! নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে । সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস করো, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন । মূসা আ: ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আশপাশের পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে নগর থেকে বের হয়ে পড়লেন। এবং আল্লাহর কাছে দুআ করে বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের থেকে রক্ষা কর ।”(সূরা কাসাস: ১৮-২১)

মাদইয়ানে হিজরত...

মূসা আ: ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নগর থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলেন । যাত্রা করার সময় তিনি দু’আ করলেন,

...عَسٰی رَبِّیۡۤ اَنۡ یَّهۡدِیَنِیۡ سَوَآءَ السَّبِیۡلِ ﴿۲۲﴾

“আমার পূর্ণ আশা আছে, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন ।”(সূরা কাসাস: ২২)

মাদইয়ান ছিল হযরত শুয়াইব আ: এর জনপদ । সে জনপদে ছিল অনেক কূপ। যখন মূসা আ: কূপের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে দেখলেন কূপের চারপাশে একদল মানুষ ভিড় করে আছে, যারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছে । তিনি আরো লক্ষ্য করলেন লোকদের থেকে কিছু দূরে দুজন নারী তাদের পশুসহ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কী চাও?” তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে নিয়ে পানি পান করানোর জন্য অপেক্ষা করছি । এগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পানি পান করাতে পারবো না যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে যায় । তারা আরো বললো, আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। অর্থাৎ তাদের পিতা এতই বৃদ্ধ ছিলেন যে পশুদেরকে পানি পান করানো

তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না তাছাড়া ঘরে অন্য কোন পুরুষও ছিল না । তাই তারাই পশুদেরকে পানি পান করাতে ঘর থেকে বের হয়েছে। অতঃপর মূসা আ: তাদের পশুগুলোকে কূপ থেকে পানি পান করালেন । পশুগুলোকে মেয়ে দুটির কাছে ফেরত দিয়ে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

رَبِّ اِنِّیۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَیَّ مِنۡ خَیۡرٍ فَقِیۡرٌ ﴿۲۴﴾

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তারই মুখাপেক্ষী।"(সূরা কাসাস: ২৪)

এরপর তরুণী দুজন তাদের পশু নিয়ে ঘরে ফিরলেন এবং তাদের পিতা কে মূসা আ: সম্পর্কে অবগত করলেন । ঘটনা শুনে তাদের পিতা মূসা আ: কে ডেকে পাঠালেন । তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে এক মেয়েকে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনার জন্য। মূসা আ: তখনো সেই গাছের ছায়ায় বসেছিলেন । তখন সেই মেয়েটি কিছুটা দূর থেকে লাজুক ভঙ্গিমায় তাঁকে বললেন, শুনছেন, আমার পিতা আপনাকে রাখছেন আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন তিনি তার পারিশ্রমিক দিতে চাচ্ছেন ।" তখন মূসা আ: মেয়েটির পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলো। যখন তিনি তাদের পিতার কাছে এসে পৌঁছলেন, তাকে তাঁর সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন । তখন তাদের পিতা বললেন, "ভয় পেয়ো না। তুমি জালিম সম্প্রদায় হতে মুক্তি পেয়ে গিয়েছো।" তাদের কথোপকথনের পর, সেই তরুণীদের একজন বললেন, "বাবা আপনি একে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ দিন । আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারো থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে হবে শক্তিশালী এবং আমানতদারও ।"(সূরা কাসাস:২৫-২৬) তার পিতা মূসা আ: কে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আট বছর আমার এখানে কাজ করবে। আর যদি তুমি ১০ বছর পূর্ণ কর সেটা তোমার নিজ এখতিয়ার । আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারীদের একজন পাবে ।" মূসা আ: বললেন, "আমার ও আপনার মধ্যে এ বিষয়টা স্থির হয়ে গেল । আমি দুই মেয়াদের যেটিই পূর্ণ করি তাতে আমার প্রতি কোন বাড়াবাড়ি চলবে না আর আমরা যে কথা বলছি আল্লাহই তার রক্ষাকর্তা।" মূলত এটাই ছিল তাদের বিবাহের মোহরানা। এই তরুণী ছিলেন শুয়াইব আ: এর সেই কন্যা যিনি মূসা আ:কে ডাকতে গিয়েছিলেন। মূসা আ: এর সঙ্গে তারই বিবাহ হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং ঐচ্ছিক দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐচ্ছিক দু'বছরও তিনি পূর্ণ করবেন'।**(২)**

✍ পুনরায় মিসর গমন...

মূসা আ: যখন তার কাজের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ন করলেন । তখন তিনি তার পরিবার নিয়ে রাতের বেলা মিসরের দিকে রওনা হলেন । তিনি ভাবলেন এখন হয়তো সেখানে তার আর কোন ভয় নেই । যখন তাঁরা তুর পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন মূসা আ: সেখানে আগুন দেখতে পেলেন । তিনি নিজ পরিবারকে বললেন, "তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি একটা আগুন দেখতে পাচ্ছি হয়তো সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন সংবাদ আনতে পারব অথবা আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।"

যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন তুর পাহাড়ের ডান উপত্যকার কিনারায় অবস্থিত বরকতপূর্ণ ভূমির একটি বৃক্ষ থেকে আওয়াজ এল, "হে মুসা! আমিই আল্লাহ, জগৎসমূহের প্রতিপালক । সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেলো। কেননা তুমি এখন পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছো । আমি তোমাকে নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করেছি । সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোনো । নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ । আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো । নিশ্চয়ই কেয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তার সময় গোপন রাখতে চাই। যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করে । সুতরাং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, এমন কোন ব্যক্তি যেনো তোমাকে তা হতে গাফেল করতে না পারে তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে । হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? মূসা আ: বললেন, এটা আমার লাঠি আমি এতে ভর করি এর দ্বারা আমার মেষ পালের জন্য পাতা ঝাড়ি এবং এর দ্বারা আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সমাধা হয়। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! ওটা নিচে ফেলে দাও। অতঃপর মূসা আ: যখন লাঠিটি ফেলে দিলেন তখন দেখলেন সেটি একটি ধাবমান সাপে পরিণত হলো । তা দেখে মূসা আ: ভয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন । আল্লাহ বললেন, "হে মূসা সামনে এসো। ভয় পেয়ো না । আমি এখনই ওটা পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি । আর তুমি তোমার হাত নিজ বগলে রাখো । তা কোন রোগ ব্যতীত শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে । এ দুটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে বলিষ্ঠ প্রমান, ফিরআউন ও তার পারিষদ বর্গের প্রতি। এবার ফিরআউনের কাছে যাও । সে অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করেছে। তখন মূসা আ: বললেন,

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ- وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْراً مِّنْ أَهْلِيْ- هَارُوْنَ أَخِي- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ- وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْراً- وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْراً- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْراً-(٢-٣٥)

"হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে। আমার স্বজনদের মতো হতে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন । আমার ভাই হারুন কে । তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করুন। এবং তাকে আমার কাছে শরিক বানিয়ে দিন। যাতে আমরা বেশি পরিমাণে আপনার তাসবিহ করতে পারি । এবং বেশি পরিমাণে আপনার জিকির করতে পারি। নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।"(সূরা ত্বহা:২৫-৩৫)

আল্লাহ তায়ালা বললেন, "হে মূসা! তুমি যা কিছু চেয়েছো তা তোমাকে দেওয়া হল ।"(সূরা ত্বহা:৩৬) অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহ বললেন, "আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করে দিচ্ছি এবং তোমাদের উভয়কে এমন প্রভাব দান করছি যে আমার নিদর্শনাবলীর বরকতে তারা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না । তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই জয়ী হয়ে থাকবে।"(সূরা কাসাস: ৩৫)

বলা হয়ে থাকে, মূসা আ: শৈশবে এক জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে দিয়েছিলেন যার কারণে তাঁর মুখে কিছুটা জড়তার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই তিনি দুআ করেছিলেন যে, তাঁর ভাই হারুন আ: কেও যেন তাঁর সাথে নবী বানিয়ে পাঠানো হয় কেননা তাঁর জবান বেশি স্পষ্ট ।

✎ ফিরআউনের নিকট মূসা ও হারুন আ: এর দাওয়াত...

মূসা আ: অবশেষে আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন নিয়ে মিসরে প্রত্যাবর্তন করলেন । আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ও তাঁর ভাই হারুন আ: কে নির্দেশ দিলেন, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার জিকিরে শৈথিল্য করো না । উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও। সে সীমালংঘন করেছে। তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে । তাঁরা বললেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে কিনা আমাদের উপর অত্যাচার করে অথবা সীমালংঘন করতে উদ্যত হয় ।" আল্লাহ বললেন, "ভয় করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি সব শুনি ও দেখি ।"(সূরা ত্বহা:৪২-৪৬)

আল্লাহর নির্দেশমত মূসা ও হারূণ ফেরাঊন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর মূসা ফিরআউনকে বললেন,

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ- حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ- (الأعراف-(১০৫-১০৪

“হে ফিরআউন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ’তে প্রেরিত রাসূল। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি দৃঢ়চিত্ত। আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছি। অতএব তুমি বনু ইসরাইলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।” (সূরা আ‘রাফ:১০৪-১০৫) মূসা আ: এর এই দাবী থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময় বনী ইসরাইলের উপরে ফিরআউনের ও তার সম্প্রদায়ের যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং তাদের সঙ্গে আপসে বসবাসের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে চাইলেন।

বনী ইসরাইলকে তাদের সাথে পাঠাতে বললে, ফিরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে তোমার শিশুকালে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি? তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝেই কাটিয়েছো । আর তোমার যে কান্ড তুমি করেছিলে সে তো করেছই । বস্তুত তুমি একজন অকৃতজ্ঞ লোক। মূসা আ: বললেন, “আমি সে কাজটি এমন অবস্থায় করেছিলাম যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। আমি যখন তোমাদেরকে ভয় করলাম, তখন তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে হিকমত দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন । আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ তার স্বরূপ তো এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দাস বানিয়ে রেখেছো ।” ফিরআউন বলল, “রাব্বুল আলামিন আবার কি?” মূসা আ: বললেন, “তিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমাদের বাস্তবিকই বিশ্বাস করার থাকে ।” তখন ফিরআউন তার আশপাশের লোকদেরকে বলল, “তোমাদের এই রাসূল যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সে একেবারেই উন্মাদ।” (সূরা শুআরা:১৮-২৭)

অতঃপর ফিরআউন বলল, “তুমি কোন নিদর্শন এনে থাকলে তা পেশ কর। যদি তুমি সত্যবাদী হও।” তখন মূসা আ: নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক অজগরে পরিণত হলো। এবং নিজহাত বগল থেকে বের করে আনলো এরপর তা সকলের সামনে চমকাতে লাগলো । এ দুটি ছিল সেই মু’জিযা যা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করেছিলেন ।কথিত আছে, সে যুগে জাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিল তাই তাঁকে এমন মু’জিযা দেয়া হলো যা জাদুকরদের কেও হার মানিয়ে দেয় এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছে তাঁর নবুয়তের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঘটল এর ব্যতিক্রম । তাঁর এই সকল মু’জিযা দেখে ফিরআউনের কওমের

সরদারগণ একে অন্যকে বলতে লাগলো, “নিশ্চয়ই সে একজন দক্ষ জাদুকর ।” (সূরা আরাফ: ১০৯)
তারা যখন মূসা আ: এর মু'জিযাকে জাদু ঠাওড়ালো তখন মূসা আ: বলেছিলেন, “আমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন কে তার নিকট থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং পরিনামে কে লাভ করবে উৎকৃষ্ট ঠিকানা । অর্থাৎ আমি যা নিয়ে এসেছি তা কোন জাদু নয় যা মেকি । এটা নিশ্চিত যে জালিমগণ সফলকাম হবে না।” তখন ফিরআউন তাকে উপহাস করে বলল, “হে পারিষদবর্গ! আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবুদ আছে বলে জানিনা আর হে হামান! তুমি আমার জন্য আগুন দিয়ে মাটি জ্বালাও অর্থাৎ ইট তৈরি কর এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত তৈরি করো যাতে আমি তার ওপর উঠে মূসার প্রভুকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার পূর্ণ বিশ্বাস সে একজন মিথ্যাবাদী।” (সূরা কাসাস:৩৭-৩৮)

যারা মূসা আ: এর আনিত নিদর্শনকে জাদু বলেছিল, তারা আরও বললো, “মূসা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন বলো তোমরা কি পরামর্শ দাও? তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন এবং নগরে নগরের সংগ্রাহক পাঠান । যাতে তারা সকল দক্ষ জাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসে।”(সূরা আরাফ:১১০-১১২) অর্থাৎ তারা চাইছিল জাদুকরদের দ্বারা মূসা আ: কে পরাস্ত করতে । অতঃপর তাদের কথা অনুযায়ী তাই করা হলো,
নগরের যত বড় বড় এবং বিখ্যাত জাদুঘর ছিল তাদেরকে ফিরাউনের দরবারে ডেকে আনা হলো, তারা ফিরআউনকে বলল, “আমরা যদি মূসার বিরুদ্ধে জয়ী হই তবে আমরা অবশ্যই পুরস্কার লাভ করবে তো?” ফেরাউন বলল, “হ্যাঁ এবং তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে ।”

সকল জাদুকরদের একত্র করার পর, ফিরআউন মূসা আ: কে বলল, “আমরা তোমার সামনে অবশ্যই অনুরূপ জাদু উপস্থিত করবো। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন উন্মুক্ত স্থানে পরস্পরের মোকাবেলা করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করো যার ব্যতিক্রম আমরাও করবো না এবং তুমিও না ।” মূসা আ: বললেন, যেদিন আনন্দ উদযাপন করা হয় তোমাদের সাথে সেদিনই স্থিরকৃত রইল এবং এটা স্থির থাকল যে দিন চড়ে ওঠা মাত্রই মানুষকে সমবেত করা হবে ।

সুতরাং নির্ধারিত দিন এসে উপস্থিত হলো। জাদুকররা মূসা আ: কে বলল, হে মূসা! চাইলে তুমি যা নিক্ষেপের ইচ্ছা রাখ তা নিক্ষেপ করো। নয়তো আমরা নিক্ষেপ করি । মূসা আ বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ করো । তখন জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি মাটিতে ফেলে দিল

এবং বলল ফিরআউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো । অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে মূসা আ:-কে তার লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলেন । যেই না তিনি মাটিতে লাঠিটি নিক্ষেপ করলেন অমনি তা এক বিশাল অজগর সাপ হয়ে তাদের লাঠিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো । এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে জাদুকরগণ সিজদায় পতিত হলো । আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই মু'জিযা এতই শক্তিশালী ছিল যে তার প্রভাবে তারা সকলে সিজদা করতে বাধ্য হয়ে যায়। তারা বলে উঠলো, আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি । যিনি মূসা ও হারুন এর প্রতিপালক ।

এই দৃশ্য দেখে ফিরআউন বলল, "আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের সকলের গুরু, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে । তোমরা শহরে এসব চক্রান্ত করেছ যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে পারো । আচ্ছা, তোমরা এখনি জানতে পারবে । আমি আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে ছাড়বো।"(সূরা শুআরা:৪৯, সূরা আরাফ:১২৩-১২৪) জাদুকররা বলল, "আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা বিশ্বাস করি আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব । আমরা আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এজন্য যে, আমরা সকলের আগে ঈমান এনেছি।"(সূরা শুআরা:৫০-৫১) তুমি কি কেবল এই কারণেই আমাদের প্রতি রুষ্ট হচ্ছ যে যখন আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা তাতে ঈমান এনেছি? এরপর তারা আল্লাহর নিকট দুআ করে বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবর ঢেলে দাও এবং তোমার তাবেদার রূপে আমাদের মৃত্যুদান কর।"(সূরা আরাফ:১২৬)

তারা চলে গেলে ফিরআউনের কওমের নেতৃবর্গ তাকে বলল, "আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায় কে কি এমনি ছেড়ে দিবেন, যাতে তারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করতে ও আপনার উপাস্যদের কে বর্জন করতে পারে ?" সে বলল, "আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং নারীদেরকে জীবিত রাখব আর তাদের উপর তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছেই ।"(সূরা আরাফ: ১২৭)

এরপর আল্লাহ তায়ালা মূসা আ: এর নিকট ওহী পাঠালেন। আল্লাহ বললেন, "আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুমি রাতারাতি রওনা হয়ে যাও তোমাদের কিন্তু অবশ্যই পশ্চাদ্ধাধন করা হবে ।" ওহী পেয়ে মূসা আ: তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নগর থেকে বেরিয়ে পড়লেন । এদিকে ফিরআউনের বাহিনী সূর্যোদয় মাত্রই তাঁদের পশ্চাদ্ধাধন করতে বেরিয়ে পড়ল ।

মূসা আ: ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চলতে থাকলেন কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের সামনে সমুদ্র বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো । অপরদিকে ফিরআউনও তার দলবল নিয়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল । একদল যখন অন্য দলকে দেখতে পেল তখন মূসা আ: এর সঙ্গীগণ বলল, "আমরা এখন নির্ঘাত ধরা পড়বো।" কিন্তু মূসা আ: বললেন, "কখনো না। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন । তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন,"তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর।" আল্লাহর নির্দেশ মতো তিনি সমুদ্রে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে সাগর বিদীর্ণ হল এবং প্রত্যেকভাগ বড় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের পার হওয়ার জন্য সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা তৈরি করে দিলেন। সমুদ্রের বুকে রাস্তা দেখতে পেয়ে ফিরআউন ও তার বাহিনী মনে করল যে তারাও সেই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যাবে এবং মূসা আ: ও তার সঙ্গীদেরকে পাকড়াও করে ফেলবে । অতঃপর মূসা আ: ও তার সঙ্গীরা সমুদ্র পার হয়ে গেল । কিন্তু ফিরআউন তার বাহিনী সহ তাদের অনুসরণ করতে করতে যখনই সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছালো তখন আল্লাহ তায়ালা সেই রাস্তা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দিলেন । ফলে ফিরআউন সহ গোটা বাহিনী সমুদ্রে ডুবে মারা গেল । ফিরআউন যখন পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছিল, তখন সে বলতে লাগলো, "আমি স্বীকার করলাম বনী ইসরাইল যেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমিও আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।"

আল্লাহ তা'আলার নীতি হলো, যখন তাঁর আজাব কারো ওপর এসে যায় এবং সেটা নিজ চোখে দেখতে পায় অথবা যখন কারো মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় তখন তাওবার দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হয় । অর্থাৎ সে সময় ঈমান আনলে তা আর গ্রহণযোগ্য হয় না। কাজেই শেষ মুহূর্তে ফিরআউনের তাওবাও আর কবুল হলো না । তাকে উত্তর দেয়া হলো, "এখন ঈমান আনছো? অথচ এর আগে অবাধ্যতা করেছো এবং ক্রমাগত অশান্তি সৃষ্টি করেছ । সুতরাং আজ আমি তোমার কেবল দেহটি বাঁচাবো । যাতে তুমি তোমার পরবর্তীকালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। কেননা আমার নিদর্শন সম্পর্কে বহু লোক গাফেল হয়ে আছে ।"(সূরা ইউনুস: ৯০-৯২)

মহান আল্লাহ তাঁর কথা অনুযায়ী, ফিরআউনের লাশটি রক্ষা করলেন। তার লাশ সাগরে তলদেশে না গিয়ে পানির উপর ভাসতে থাকল, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়। তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি মিসরের কায়রোর জাদুঘরে এখনো পর্যন্ত সে লাশ সংরক্ষিত আছে এবং তা মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এক বিরাট নিদর্শন হয়ে আছে।

✍ ফিরআউন সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আযাব...

মূসা আ: যখন ফিরআউনের সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাকেন। তখন তারা বারবার তাঁকে ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ঈমান আনা থেকে বিরত থাকতো । তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর একের পর এক আযাব নাযিল করতে থাকেন । প্রথমে তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে এবং তারপর তারা ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিলে দুর্ভিক্ষ দুর হয়ে যায় । তারপর দেখা দিল বন্যা, যাতে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মূসা আ: কে দিয়ে দোয়া করালো, তখন পুনরায় ফসল জন্মালো । তারপর তারা আবারও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল । তখন পঙ্গপাল এসে তাদের ফসল নষ্ট করে দিল । আবারো তারা সেই প্রতিশ্রুতি দিল ফলে বিপদ দূর হয়ে গেল । কিন্তু এবারও তারা ঈমান আনলো না । ফলে তাদের শস্যতে ঘুণপোকা দেখা দিল । এবারও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটল। অতঃপর তাদের উপর বিপুল পরিমাণে ব্যাঙ ছেড়ে দেয়া হলো যা খাবার পাত্রে লাফিয়ে পড়ে সব খাবার নষ্ট করে দিত। অন্যদিকে খাবার পানিতে রক্ত দেখা দিতে লাগলো । যার দরুন তাদের পানি পান করা দুঃসাধ্য হয়ে গেল । তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার পূর্বে এই সব ছোট ছোট আযাব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাইছিলেন ।

তা সত্ত্বেও তারা ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করল এবং হঠকারিতা প্রদর্শন করলো । অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন ।

✍ বনী ইসরাইলের পরবর্তী অবস্থা...

বনী ইসরাইলের মূল নিবাস ছিল ফিলিস্তিন । মিসরে ফির'আউন তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে যখন ফির'আউন ও তার বাহিনী ডুবে মরে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ করেন। ফিলিস্তিনে আমালিকা নামক এক কাফির জনগোষ্ঠী বাস করত। সুতরাং আল্লাহ তা’আলা এজন্য এ আদেশ করেছিলেন যে, বনী ইসরাইল ফিলিস্তিনে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ছিল, সে যুদ্ধে বনী ইসরাইলই জয়লাভ করবে। কেননা সে ভূখণ্ডটিকে তাদেরই ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা আ: সে আদেশ পালনার্থে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ফিলিস্তিনের কাছাকাছি পৌঁছতেই বনী ইসরাঈল উপলব্ধি করল, আমালিকা গোষ্ঠীটি অতি শক্তিশালী। মূলত তারা ছিল আদ জাতির বংশধর। গায়ে-গতরে খুব বড়। বনী ইসরাইল তাদের বিশাল-বিশাল দেহ দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলতে লাগলো, “হে মূসা! সেখানে

তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে । যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের হয়ে না যায়, আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না । তবে যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে অবশ্যই প্রবেশ করব।" অথচ তারা চিন্তা করল না যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তি আরও বড় এবং তিনি তাদের জয়লাভের ওয়াদাও করে রেখেছেন।

তাদের মধ্যে দুইজন তাকওয়াবান ব্যক্তি যারা মূসা আ: এর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, তারা তাদের কওকে বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে অগ্রসর হও আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অনুসারে তোমরাই বিজয়ী হবে । কিন্তু এরপরও বনী ইসরাইলের লোকেরা জিহাদে যেতে অস্বীকৃতি জানালো । তারা মূসা আ: কে বলতে লাগলো, "তাদের সাথে যদি যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তুমি ও তোমার রব চলে যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর আমরা তো এখানেই বসে থাকবো।" তারা তাদের জেদ বজায় রাখল । তাদের এই একগুঁয়েমি দেখে মূসা আ: বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজস্বতা এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার কর্তৃত্ব নেই সুতরাং আপনি আমাদের ওই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিন ।"(সূরা মায়িদা:২২-২৫)

তাদের এই অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই শাস্তি দিলেন যে ৪০ বছরের জন্য তাদের ফিলিস্তিনে প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হল। তারা সিনাই মরুভূমির ছোট্ট একটি এলাকার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকলো তারা কোথাও যাওয়ার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না এবং মিসরেও ফিরে যেতে পারছিল না। মূসা ও হারুন আ: ও তাদের সঙ্গেই ছিলেন। তাদেরি দেওয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলের প্রতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের নিয়ামত অবতীর্ণ করতে থাকেন। মরুভূমিতে যেহেতু তাদের মাথার উপর কোন ছাদ ছিল না এবং প্রচন্ড রৌদ্রতাপে তারা কষ্ট পাচ্ছিল তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ নিয়োজিত করে দেন যা তাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল। মরুভূমিতে তাদের জন্য কোন ধরনের কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না । আল্লাহ তায়ালা নিজ রহমতে তাদের জন্য "মান্ন (প্রাকৃতিক চিনি বিশেষ, যা শিশিরের মত করে তৃনাদির ওপর জমাট বেঁধে যায়) ও সালওয়া (তিতির জাতীয় পাখি)" নামক উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন ।

তারা যে মরুভূমিতে আটকে গিয়েছিল সেখানে কোন পানির ব্যবস্থা ছিল না। তাই মূসা আ: তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর নিকট পানি প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করতে বললেন। যখন তিনি পাথরে আঘাত করলেন তা থেকে বারোটি প্রস্রবণ উৎসারিত হলো । প্রত্যেক গোত্রের জন্য আলাদা প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেয়া হলো যেন কোন কলহ সৃষ্টি না হতে পারে।(সূরা বাকারাহ:৬০)

এত নিয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও তারা এসবের চরম অসম্মান করল এবং সিনাই মরুভূমিতে যখন তারা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলো তখন তারা এই দাবি জানালো যে মান্ন ও সালওয়া খেতে খেতে তাদের বিতৃষ্ণা ধরে গেছে । তারা বলল, আমরা আর একই খাবার খেয়ে থাকতে পারবো না । তোমার প্রতিপালককে বলো, তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত কিছু ফসল উৎপন্ন করে দেন অর্থাৎ জমির তরকারি, কাকড়, গম, ডাল ও পেঁয়াজ । মূসা আ: তখন বললেন, "তোমরা কি উৎকৃষ্ট খাবার কে এমন জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করতে চাচ্ছ যা নিকৃষ্ট ?"(সূরা বাকারাহ:৬১)

তাদের এই ধরনের দাবিও পূর্ণ করা হলো। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের মরুভূমির সেই করুন অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হল। আল্লাহ তাআলা তাদের বললেন, "সামনে একটি জনপদ আছে ।তোমরা ওই জনপদে প্রবেশ করো এবং তার যেখান থেকে ইচ্ছা প্রাণ ভরে খাও। আর জনপদের প্রবেশদ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ করবে আর বলতে থাকবে, "হে আল্লাহ! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থী!" কিন্তু তারা এতটাই জেদি ছিল যে, জনপদে প্রবেশ করার সময় মাথা নত করা তো দূরে থাক, গর্বে বুক টান করে সেই প্রবেশদ্বার দিয়ে জনপদে প্রবেশ করল। এবং তাদেরকে যেভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছিল তারা তো তা করলোই না বরং তারা এর পরিবর্তে স্লোগান দিচ্ছিল, "গম চাই, গম।"

🖉 তাওরাত নাযিল...

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ: কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে ৪০ দিন ইতিকাফ করলে তাঁকে তাওরাত দান করা হবে। প্রথমে ইতিকাফের সময়সীমা ছিল ৩০ দিন পরে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৪০ দিন করে দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী তিনি তুর পাহাড়ে চলে গেলেন । ইতিকাফ চলাকালীন বিশ্ব জাহানের রব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর সাথে সরাসরি কথা বললেন। মূসা আ: বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দিন । আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তা যদি আপন স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। অতঃপর যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন পাহাড়ে তাজাল্লী ফেললেন অর্থাৎ নিজ জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড় কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং সাথে সাথে মূসা আ: সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন । পরে যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো, তখন তিনি বললেন, আপনার সত্তা পবিত্র। আমি আপনার দরবারে তওবা করছি এবং সবার আগে ঈমান আনছি।

দুনিয়ার কোন মানুষ তো দূরের কথা পাহাড়-পর্বতের ও এ ক্ষমতা নেই যে আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লী সহ্য করতে পারবে । এ বিষয়টি তিনি মূসা আ: কে প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই তুর

পাহাড়ে তাঁর তাজাল্লী ফেলেছিলেন । ৪০ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা মূসা আ: কে তাওরাত দান করলেন।

মূসা আ: যখন ইতিকাফের জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন তখন সামেরি নামক এক জাদুকর অলংকার দ্বারা একটা বাছুর আকৃতির মূর্তি তৈরি করল যা থেকে বাছুরের মতো হাম্বা ধ্বনি বের হচ্ছিল। বাছুরটিকে সে উপাস্য সাব্যস্ত করে বনী ইসরাইলকে তার পূজায় লিপ্ত হতে প্ররোচিত করলো । ফলে তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু হারুন আ: তাদেরকে বারবার বলতে লাগলেন যে, তোমাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রক্ত রহমান সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো। তারা বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে আমরা এর পূজায় রত থাকবো । মূসা আ: ফিরে এসে তাঁর ভাই হারুন আ: কে বললেন, তুমি যখন দেখলে তারা বিপথগামী হয়ে গেছে তখন কোন জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত রেখেছিল যে তুমি আমার অনুসরণ করলে না তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? এই বলে তিনি হারুন আ: এর দাড়ি ও মাথা ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন । হারুন আ: বললেন, “ওহে আমার মায়ের পুত্র! বিশ্বাস কর, লোকজন আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল।”

তাঁর অল্পদিনের অনুপস্থিতিতে উম্মত তাওহীদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়বে এটা বরদাশত করে নেওয়া তাঁর মতো তেজস্বী নবীর পক্ষে সহজ ছিল না। তাই এমন কি বড় ভাই হযরত হারুন আ:-এর প্রতিও তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর উপস্থিতিতে কওম এরূপ ন্যাক্কারজনক কাজ কিভাবে করতে পারল এবং তিনি তাদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য কেন জোরালো ভূমিকা রাখলেন না, এই ছিল তার অভিযোগ। বস্তুত তাকে অপমান করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না এবং কোন নবীর পক্ষে এরূপ গর্হিত কাজ করা সম্ভবও নয়। অপরদিকে হযরত হারুন আ: যে দায়িত্ব পালনে কোনও রকম অবহেলা করেছিলেন তাও নয় এবং কোনও নবী কখনও তা করেন না। তিনি জোরদার ভূমিকাই পালন করেছিলেন, যা হযরত মূসা (আ.)-এর জানা ছিল না। বাধা দানের এক পর্যায়ে যখন কওম তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কেবল তখনই তিনি ক্ষান্ত হয়েছিলেন। যে কথা তিনি 'হে আমার মায়ের সন্তান'- এই 'মায়া কাড়া' সম্বোধনে ভাইকে অবহিত করেন এবং তাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হন।

মূসা আ: বনী ইসরাইলকে তাওবা করতে উৎসাহিত করলেন এবং তাদেরকে তাওবার নিয়মও বলে দিলেন। তা ছিল এই যে তাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করেনি তারা বাছুর পূজারীদের কে হত্যা করবে। এভাবে তাদের বিপুল সংখ্যক লোকে হত্যা করা হলো এবং তাদের তাওবা কবুল হলো ।

মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত নিয়ে আসলেন এবং বনী ইসরাইলকে তার অনুসরণ করতে হুকুম দিলেন, তখন তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলল, আমরা এটা কি করে বিশ্বাস করব যে, এ কিতাব আল্লাহ তাআলাই নাযিল করেছেন? তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন, তিনি যেন কওমের সত্তর জন প্রতিনিধি বাছাই করে তাদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে আসেন। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, সেখানে তাদেরকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এতে তাদের দাবী আরও বেড়ে গেল। বলল, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাকে চাক্ষুষ না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না। এই হঠকারিতাপূর্ণ দাবির কারণে তাদের উপর এমন বজ্রধ্বনি হল যে, তাতে ভূমিকম্পের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা সকলে বেহুঁশ হয়ে গেল।

✎ সামেরির শাস্তি...

মূসা আ: সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি নির্ধারণ করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, সে কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুর ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। এটাও সম্ভবপর যে, পার্থিব আইনগত শাস্তির ঊর্ধ্বে খোদ তার সত্তায় আল্লাহর হুকুমে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে যে, মূসা আ:-এর বদদো‘আয় তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে বা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত' (কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৯৫)। এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলে উঠতো لاَمِسَاس 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না'।

✎ মূসা আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

হযরত মূসা আ: ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাবান একজন নবী ও রাসূল এবং আল্লাহর কিতাবের অন্যতম বড় দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন বনী ইসরাইলের নবী, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে ফিরআউন ও তার অত্যাচার থেকে মুক্তি দেন। মূসা আঃ তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার সম্মান লাভ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে "কালিমুল্লাহ" বলা হয়। আল্লাহ মূসা আ:-এর ওপর তাওরাত নাজিল করেন, যা বনী ইসরাইলের জন্য পথনির্দেশনা ছিল।

মূসা আ: আল্লাহ হতে প্রাপ্ত তাঁর বিভিন্ন মু'জিযা বিভিন্ন সময়ে বনী ইসরাইলের সামনে পেশ করেন। যাতে তারা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে চলে। তা সত্ত্বেও তারা বারবার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিল । এতেও মূসা আ: দমে যাননি। তিনি প্রত্যেকবার তাঁর সম্প্রদায় এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন । এবং প্রত্যেকবার তাদের ওপর পতিত আল্লাহর আযাব থেকে তাদের নিষ্কৃতির জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন । তিনি নিজ উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে কল্যাণের দোয়া করেছিলেন । তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য যে দোয়া করেছিলেন তার ভেতর বনী ইসরাইলের আগামী প্রজন্মও শামিল ছিল । তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুয়া কবুল করার সময় এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, দুনিয়ায় তো তাঁর রহমতে সকলেই রিযক ইত্যাদি লাভ করেছে । কিন্তু যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে তারা কেবল সেই সকল লোক যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুন অর্জন করবে এবং অর্থ সম্পদের আসক্তি যাদেরকে যাকাতের মত ফরজ আদায় হতে বিরত রাখতে পারবে না । সুতরাং মূসা আ: এর উম্মতের মধ্যে যারা এসব গুণের অধিকারী হবে তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে । এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলে যে সব বনী ইসরাইল জীবিত থাকবে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন তারা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে ।

পৃথিবীর ইতিহাসের সব থেকে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ফিরআউনকে মূসা আ: যে ভাষায় দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেটি ছিল আমাদের সকলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ।
আল্লাহ তা'আলা মূসা আ: এর মাধ্যমে আমাদেরকে দাওয়াতের এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যে, যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে সে যত বড় উদ্যত ব্যক্তিই হোক না কেন তাকে দাওয়াত দিতে হবে নম্র, আকর্ষণীয় ও দরদপূর্ণ ভাষায় । দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

এক কথায়, মূসা আ:-এর জীবনী একটি আদর্শিক দৃষ্টান্ত, যা ঈমান, ধৈর্য, নেতৃত্ব, এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতার শিক্ষা দেয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জীবনের সংকট মোকাবিলায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যোগায়।

☞ রেফারেন্স:

১.কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ।
২.বুখারী হা/২৪৮৭ 'সাক্ষ্য সমূহ' অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ।

হযরত ইউনুস আ:

✍ ইউনুস আ:-এর পরিচয়...

ইউনুস আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী ও রাসূল । তিনি ইরাকের 'নিনেভা' অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন । সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনেভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনেভা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

তাঁর পিতার নাম ছিল 'মাত্তা' । বুখারীর এক রেওয়ায়াতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতার নাম মাত্তা ।

হযরত ইউনুস বিন মাত্তা আ:-এর কথা পবিত্র কুরআনের মোট ৬টি সূরার **১৮**টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।**(১)** কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও যুন-নুন এবং কোথাও ছাহেবুল হূত উল্লেখ করা হয়েছে। নুন ও হূত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নুন ও সাহেবুল হুতের অর্থ মাছওয়ালা। ইউনুস আলাইহিস সালামকে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে যুন-নুন বা ছাহেবুল হূত শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

✍ নিজ কওমের প্রতি ইউনুস আ:-এর দাওয়াত...

ইরাকের বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ জনপদ নিনেভা বা নিনাওয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল । তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজ কওমকে দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করেন । কুরআন মাজিদে এই শহরের জনসংখ্যা লক্ষাধিক বলা হয়েছে । এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ اَرۡسَلۡنٰهُ اِلٰی مِائَۃِ اَلۡفٍ اَوۡ یَزِیۡدُوۡنَ ﴿۱۴۷﴾

"তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এক লাখ বা তারও কিছু বেশি লোকের কাছে ।"(সূরা আস-সাফফাত:১৪৭)

তিনি নিনাওয়াবাসীদের তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করা সত্ত্বেও তারা তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত করলো না । বরং নাফরমানি ও অবাধ্যতার সঙ্গে শিরক ও কুফরের ওপর হটকারিতা করতে থাকলো । তাদের বারংবার বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার কারণে তাদের ওপর ইউনুস আ: অসন্তুষ্ট ও ব্যথিত হলেন । তারা যখন কিছুতেই তাঁর আহবানে সাড়া দিল না তখন তিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন, তিন দিনের ভেতরেই তোমাদের উপর আযাব আসবে এবং তারপর তিনি সেই জনপদ থেকে অন্যত্র চলে গেলেন । তাঁর কওমের লোক বলাবলি করল, ইউনুস আ: তো কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, কাজেই তিনি যদি এলাকা ছেড়ে চলে যান, বুঝবে তিনি সত্য বলেছেন । পরে তারা দেখল যে তিনি সত্যিই চলে গিয়েছেন এবং তারা এমন কিছু শাস্তির আলামত দেখতে পেল যার দরুন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ইউনুস আ: যে ব্যাপারে তাদের সাবধান করেছিলেন তা সত্য । তখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং আযাব আসার আগেই তাওবা করে সকলেই ঈমান আনলো । ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের আযাব সরিয়ে নিলেন ।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা ইউনুসে বলেছেন,

فَلَوۡ لَا كَانَتۡ قَرۡيَۃٌ اٰمَنَتۡ فَنَفَعَہَاۤ اِيۡمَانُہَاۤ اِلَّا قَوۡمَ يُوۡنُسَ ؕ لَمَّاۤ اٰمَنُوۡا كَشَفۡنَا عَنۡہُمۡ عَذَابَ الۡخِزۡىِ
فِى الۡحَيٰوۃِ الدُّنۡيَا وَ مَتَّعۡنٰہُمۡ اِلٰى حِيۡنٍ ﴿۹۸﴾

“অতঃপর কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের কাজে আসত? তবে ইউনুস এর সম্প্রদায় ছাড়া, তারা যখন ঈমান আনল তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।”(সূরা ইউনুস: ৯৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলছেন, পূর্বে যত জাতির ওপর আযাব এসেছে তারা কেউ আযাব আসার আগে ঈমান আনেনি। যে কারণে তারা আযাবের শিকার হয়েছে । কিন্তু ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম ছিল এর ব্যতিক্রম । কারণ তারা আযাবের লক্ষণাদি দেখে আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তাওবা কবুল হয়ে যায়।

তাদের ঈমানের কারণ ছিল, তারা তাদের রাসূলের মুখে যে আযাব আসার কথা শুনেছিল সেটার বিভিন্ন উপসর্গ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আর তারা দেখল যে, তাদের রাসূলও তাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছেন। তখন তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইল, তার কাছে উদ্ধার কামনা করল, কান্নাকাটি করল এবং বিনয়ী হল। আর তারা তাদের শিশু-সন্তান, জন্তু-জানোয়ারদের

পর্যন্ত উপস্থিত করেছিল এবং আল্লাহর কাছে তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেয়ার আহবান জানিয়েছিল। আর তখনই আল্লাহ তাদের উপর রহমত করেন এবং তাদের আযাব উঠিয়ে নেন, তাদেরকে কিছু দিনের জন্য দুনিয়াকে উপভোগ করার সুযোগ প্রদান করেন [ইবন কাসীর]
আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি; বরং একান্তভাবে তাঁর নিয়মানুযায়ীই তাদের ঈমান ও তাওবা কবুল করে নেয়া হয়েছে। তাবারী প্রমূখ তাফসীরকারও এ ঘটনাকে ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তাওবা করা ও আল্লাহর জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিই আযাব না আসার কারণ ।

✍ মাছের পেটে ইউনুস আ:...

তাদের তাওবার কথা ইউনুস আ: এর জানা ছিল না । তুমি যখন দেখলেন তিনদিন গত হওয়ার পরও আযাব আসলো না, তখন ভয় পেয়ে গেলেন এবং আশঙ্কা বোধ করলেন এলাকায় ফিরে গেলে তাঁর কওমের লোক তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে । এমনকি তারা তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারে । অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি আশঙ্কায় তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুম আসার আগেই সাগরের দিকে অগ্রসর হলেন । এলাকায় আর ফিরলেন না। এবং সাগর পার হওয়ার জন্য তিনি একটি নৌকায় আরোহন করলেন । সূরা আস-সাফফাতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, (إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)
"স্মরণ করুন, যখন তিনি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গেলেন।" (আস-সাফফাতঃ ১৪০) এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে أَبَقَ শব্দে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু নবী-রাসূলগণের রীতি হলো এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত তাঁরা হিজরত করেন না। তিনি যেহেতু আল্লাহতালার এক মহা মর্যাদাবান নবী, তাই আদেশ পাওয়ার আগেই তাঁর এলাকা ত্যাগ আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হলো না । যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাঁদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহর পরীক্ষায় পতিত হন।

ইউনুস আ: যে নৌকাতে আরোহন করেছিলেন তা ছিল যাত্রীতে বোঝাই । যাত্রী বেশি হওয়ার কারণে নৌকাটি মাঝপথে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল । কাজেই বোঝা হালকা করার জন্য

নৌকারোহীরা একজনকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । কিন্তু কাকে ফেলা হবে এটা নিষ্পত্তির জন্য পারস্পরিক সিদ্ধান্তক্রমে লটারি করা হলো । অতঃপর তিনবার লটারি করা হলো কিন্তু প্রতিবারই ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম উঠে এলো । তখন তারা ইউনুস আ: কে পানিতে নিক্ষেপ করল কিংবা তিনি নিজেই নিজেকে নিক্ষেপ করলেন । এই মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলার হুকুমে সেখানে একটি মাছ তাঁর অপেক্ষায় ছিল । মাছটি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গিলে ফেলল ।

আল্লাহ তাআলা সূরা সাফফাতে এই সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন,

فَسَاہَمَ فَکَانَ مِنَ الۡمُدۡحَضِیۡنَ ﴿۱۴۱﴾ۚفَالۡتَقَمَہُ الۡحُوۡتُ وَ ہُوَ مُلِیۡمٌ ﴿۱۴۲﴾

"অতঃপর সে লটারিতে শরিক হলো এবং তাতে পরাভূত হল । তারপর মাছ তাকে গিলে ফেলল আর সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল।"(সূরা আস-সাফফাত:১৪১-১৪২)

মাছটি তাকে গিলে ফেললেও মাছের পেটে তিনি হজম হয়ে যাননি। তিনি কিছুকাল তার পেটে থাকলেন । ইউনুস আ: মাছের পেটে কত সময় বা কতদিন ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় তার মেয়াদ ছিল তিন দিন । কোন কোন বর্ণনায় কয়েক ঘন্টার কথাও বলা হয়েছে । তিনি যখন মাছের পেটে নিজেকে জীবিত দেখলেন তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের অনুতাপ ও লজ্জা প্রকাশ করলেন, কেন আমি আল্লাহ তায়ালার ওহীর অপেক্ষা না করে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে, উম্মতের প্রতি ধর্ম প্রচার থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে নীনাওয়া থেকে বেরিয়ে এলাম । তাই তিনি আল্লাহর দরবারে এভাবে তাসবিহ পাঠ করতে বা দোয়া করতে লাগলেন,

لَّاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَکَ ٭ۖ اِنِّیۡ کُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿ۚ۸۷﴾

"তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই তুমি মহান ও পবিত্র । নিশ্চয়ই আমি একজন অপরাধী ।" (সূরা আম্বিয়া:৮৭)

আল্লাহ তাআলা তার দু'আ কবুল করলেন এবং মাছকে হুকুম দিলেন সে যেন তাঁকে বের করে তীরে নিক্ষেপ করে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন, মাছের পেটে অবস্থানের দরুন তাঁর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যেমন পাখির একটি নবজাতক বাচ্চা । অর্থাৎ তাঁর গায়ে কোনো লোম অবশিষ্ট ছিল না। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন । আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন,

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ -
وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِيْن١٤٦-١٤٣)-ِ

"সুতরাং সে যদি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তবে মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত সে মাছেরই পেটে থাকতো । অতঃপর আমি তাকে পিরিত অবস্থায় একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। এবং তার ওপর উদগত করলাম একটি লতাযুক্ত গাছ ।" (সূরা আস-সাফফাত:১৪৩-১৪৬)
আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি লতাগুলো বিশিষ্ট গাছ উৎপন্ন করে দিলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সেটি ছিল লাউ গাছ । তিনি তার ছায়া লাভ করছিলেন এবং সম্ভবত তার ফলকে তাঁর জন্য ঔষধ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল । এক সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন ।

অন্যত্র আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ- لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ- فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- (٦٨-٥٠)

"তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালার (ইউনুসের) মত হয়ো না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল'। 'যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ'লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।" (সূরা ক্বলাম ৬৮:৪৮-৫০)
যদি আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁকে সামাল না দিত, তাহলে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত-এর অর্থ আল্লাহ যদি তাকে তওবা করার তাওফীক্ব না দিতেন এবং তার দো'আ কবুল না করতেন, তাহলে তাকে জীবিত অবস্থায় নদী তীরে মাটির উপর ফেলতেন না। এবং ইউনুস আ: মাছের পেটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাকে পুনরায় কাছে টানলেন ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

অন্যত্র ইউনুস আ: ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ ছেড়ে চলে আসা, মাছের পেটে বন্দী হওয়া এবং ঐ অবস্থায় আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,
وَ ذَاالنُّوۡنِ اِذۡ ذَّہَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنۡ لَّنۡ نَّقۡدِرَ عَلَیۡہِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنۡ لَّاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَکَ ٭ۖ اِنِّیۡ کُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿ۚ۸۷﴾ فَاسۡتَجَبۡنَا لَہٗ ۙ وَ نَجَّیۡنٰہُ مِنَ الۡغَمِّ ؕ وَ کَذٰلِکَ نُــۨۡجِی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۸۸﴾

"এবং মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তাকে পাকড়াও করবো না । অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহবান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা আম্বিয়া ২১:৮৭-৮৮)
ইউনুস আ:-এর উক্ত দু'আ দু'আয়ে ইউনুস' নামে পরিচিত ।

✍ইউনুস আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

রাসূল সা: ইউনুস আলাইহিস সালামের আলোচনা করে তার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কেউই যেন এ কথা কখনো না বলে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম ।"
পবিত্র কুরআনে তাঁকে "যুন-নূন" (মাছের সঙ্গী) এবং "সাবিরীনদের" অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বিভিন্ন স্থানে তাঁর ঘটনা উল্লেখ করে মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একমাত্র নবী, যিনি মাছের পেটের অন্ধকার থেকে আল্লাহর রহমতে মুক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তাঁর ধৈর্য ও তাওবার জন্য তাঁকে মর্যাদা দান করেন।আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা সবসময়ই মুক্তির পথ। ইউনুস (আঃ)-এর দু'আ থেকে বোঝা যায় যে আন্তরিক তাওবা আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম উপায়।
ইউনুস আ: এর জীবনী থেকে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা পাওয়া যায় । একজন দাঈ (দাওয়াতদাতা)-এর জন্য ধৈর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কওমের প্রতিরোধের মুখেও দ্বায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে দৃঢ় থাকা উচিত। ইউনুস আ:-এর জীবনী ধৈর্য, তাওবা, এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসার এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে এবং কখনো হতাশ হওয়া উচিত নয়। তাঁর দু'আ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিপদ থেকে মুক্তির একটি অসাধারণ উপহার।

☞ রেফারেন্স:

১. যথাক্রমে (১) সূরা নিসা ৪/১৬৩; (২) আন'আম ৬/৮৬; (৩) ইউনুস ১০/৯৮; (৪) আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮; (৫) ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪৮; (৬) ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০। সর্বমোট = ১৮টি

হযরত দাঊদ আ:

✍ দাঊদ আ: এর পরিচয়...

হযরত দাঊদ আ: ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রেরিত একজন মর্যাদবান নবী ও রাসূল । দাঊদ আ: এর অতুলনীয় বীরত্ব বনী ইসরাইলদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। দাঊদ আ:-ই পরবর্তীকালে বনি ইসরাইলদের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাসূল ও পয়গম্বর হয়েছেন । তিনিই প্রথম ব্যক্তি যার সত্ত্বায় একইসঙ্গে নবুওয়াত ও বাদশাহী উভয়ের সম্মিলন ঘটে । বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন মাত্র দু'জন। তাঁরা হলেন পিতা ও পুত্র দাঊদ ও সুলায়মান আ:। বর্তমান ফিলিস্তিন সহ সমগ্র ইরাক ও শাম (সিরিয়া) এলাকায় তাঁদের রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ছিলেন সর্বদা আল্লাহর প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ।
উল্লেখ্য যে, হযরত দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের ৯টি সূরায় ২৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।**(১)**

✍ দাঊদ আ: এর বীরত্ব...

ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তির লাভের পর হযরত মূসা আ: বনি ইসরাইলকে আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ডাক দিয়েছিলেন। কেননা আমালিকা সম্প্রদায় বনি ইসরাইলের দেশ ফিলিস্তিনকে দখল করে নিয়েছিল । কিন্তু বনী ইসরাইল যুদ্ধ করতে সাফ অস্বীকার করল । তার শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতে আটকে দেওয়া হয় । মূসা আ:-এর ইন্তেকালের পর তাদের মাঝে অপর একজন নবী আসা পর্যন্ত সেই পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের হামলা তাদের উপর চলতেই থাকে এবং তারা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ফেলে । এবং তারা তাদের বরকতপূর্ণ সিন্দুক লুটে নিয়ে যায়। এই সিন্দুকে হযরত মূসা আ: হযরত হারুন আ:-এর বিভিন্ন স্মৃতি সংরক্ষিত ছিল । আরো ছিল তাওরাতের কপি ও আসমানী খাদ্য "মান্না" এর নমুনা । যুদ্ধকালে বরকত লাভের উদ্দেশে বনি ইসরাইল এই সিন্দুকটি তাদের সম্মুখভাগে রাখত । মূসা আ: পরবর্তী নবী আসার পরও যথারীতি বনি ইসরাঈলদের উপর জুলুম নিপীড়ন চলতে থাকে ।

শেষে তারা তাদের নবীর কাছে আবেদন করলো, তিনি যেন তাদের জন্য একজন বাদশা মনোনীত করেন। যাতে তারা তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে পারে। তখন তাদের নবী তাদেরকে

বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ্ করে পাঠিয়েছেন ।(সূরা বাকারাহ:২৪৭) কিন্তু তারা তালূতকে বাদশাহ্ মানতে অস্বীকার করল । এবং তার বাদশাহীর স্বপক্ষে কোন নিদর্শন দাবি করল । তখন তাদের নবী তাদের বললেন তালূতের বাদশাহীর আলামত হচ্ছে পৌত্তলিক সম্প্রদায়েরা যে বরকত পূর্ণ সিন্দুক লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, ফেরেশতাগণ সেটি তোমাদের কাছে বয়ে আনবে।(সূরা বাকারাহ:২৪৮) তালূত যখন সৈন্যদের সাথে রওনা হলেন তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আল্লাহ একটি নদীর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন । যে ব্যক্তি সে নদীর পানি পান করবে সে আমার লোক নয় । আর যে তা পান করবে না, সে আমার লোক । অবশ্য কেউ নিজ হাত দ্বারা এক আজলা ভরে পানি নিলে কোন দোষ নেই । তারপর তাদের অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলেই নদী থেকে পানি পান করল । সুতরাং যখন তালূত ও তার সৈন্যরা নদীর ওপারে পৌঁছিল তখন তাদের মধ্যে যারা তারা আদেশ অমান্য করেছিল তারা বলতে লাগলো আজ জালূত ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করার কোন শক্তি আমাদের নেই । জালূত ছিল শত্রু সৈন্যের মধ্যে এক বিশালাকায় পালোয়ান । কিন্তু যারা তার আনুগত্য করেছিল তারা সবরের সাথে তার সঙ্গে অবস্থান করল । তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হলো তখন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবরের গুণ ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে অবিচল পথে রাখো । আর কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর ।(সূরা বাকারাহ:২৪৯-২৫০) জালূত বিরাট সাজ-সজ্জা করে হাতীতে সওয়ার হয়ে সামনে এসে আস্ফালন করতে লাগল এবং সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সেরা যোদ্ধাকে আহবান করতে থাকল। অল্পবয়স্ক বালক দাঊদ নিজেকে সেনাপতি তালূতের সামনে পেশ করলেন। তালূত তাকে পাঠাতে রাযী হ'লেন না। কিন্তু দাঊদ নাছোড় বান্দা। অবশেষে তালূত তাকে নিজের তরবারি দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং আল্লাহর নামে জালূতের মোকাবিলায় প্রেরণ করলেন। অতঃপর দাঊদ আ: জালূতের সামনে গিয়ে আল্লাহর নাম নিলেন এবং একটা পাথর তুলে তার কপাল বরাবর নিক্ষেপ করলেন। পাথরটি তার মাথার ভিতর ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । এবং তরবারি দ্বারা জালূতকে হত্যা করলেন ।

জালূত নিধনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করার কারণে হযরত দাঊদ আ: বনী ইসরাইলদের মধ্যে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেন যে, পরবর্তীকালে তিনি বনি ইসরাইলের বাদশাহী লাভ করেন । তদুপরি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদা ও ভূষিত করেন । এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللهِ ۙ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾

"অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি ।" (সূরা বাকারাহ:২৫১)

✍ নবুওয়াত ও রিসালাত...

হযরত দাঊদ আ: এর নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ لَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ النَّبِیّٖنَ عَلٰی بَعۡضٍ وَّ اٰتَیۡنَا دَاوٗدَ زَبُوۡرًا ﴿۵۵﴾

"আমি কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর আমি দাঊদকে যাবুর দিয়েছিলাম ।"(সূরা ইসরা:৫৫)

✍ দাঊদ আ: এর মু'জিযা সমূহ...

প্রত্যেক নবী ও রাসূলকেই মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য বা মু'জিযা দান করেছেন। তদ্রুপ দাঊদ আ: ও ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু মু'জিযার অধিকারী। আল্লাহ তাঁকে অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠ দিয়েছিলেন । আল্লাহ তায়ালা পাহাড়-পর্বত ও পাখিদের কেউ তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠে রত থাকার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন । ফলে তিনি যখন যিকির করতেন তখন পাহাড়ও তার সাথে যিকির ও তাসবীহ পাঠে রত হত এমনকি উড়ন্ত পাখিরাও তাঁর সঙ্গে যিকিরে মশগুল হয়ে যেত । এতে পরিবেশ এক অপার্থিব সুর-মুর্ছনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো । আল্লাহ তাআলা কুরআনে তার এই মু'জিযার কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَ لَقَدۡ اٰتَیۡنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضۡلًا ؕ یٰجِبَالُ اَوِّبِیۡ مَعَهٗ وَ الطَّیۡرَ ۚ

"আর অবশ্যই আমি আমার পক্ষ থেকে দাঊদকে দিয়েছিলাম মর্যাদা এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদ এর সাথে বার বার আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পাখিরা তোমরাও ।"(সূরা সাবা:১০)

সূরা সোয়াদে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন,

اِنَّا سَخَّرۡنَا الۡجِبَالَ مَعَہٗ یُسَبِّحۡنَ بِالۡعَشِیِّ وَ الۡاِشۡرَاقِ ﴿ۙ۱۸﴾ وَ الطَّیۡرَ مَحۡشُوۡرَۃً ؕ کُلٌّ لَّہٗۤ اَوَّابٌ ﴿۱۹﴾

"নিশ্চয় আমরা অনুগত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং সমবেত পাখীদেরকেও; তারা তাঁর সঙ্গে যিকিরে লিপ্ত থাকতো ।" (সূরা সোয়াদ:১৮-১৯)

আল্লাহ্ তাআলা দাঊদ আ:-কে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সুদৃঢ় সাম্রাজ্য, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য বাগ্মিতা। এ সম্পর্কে সূরা সোয়াদ এ বলা হয়েছে,

وَ شَدَدۡنَا مُلۡکَہٗ وَ اٰتَیۡنٰہُ الۡحِکۡمَۃَ وَ فَصۡلَ الۡخِطَابِ ﴿۲۰﴾

"আর আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।"(সূরা সোয়াদ:২০)

হযরত দাঊদ আ: দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন । এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, (وَ اذۡکُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَیۡدِ ۚ اِنَّہٗۤ اَوَّاب) ১৭ "স্মরণ করুন, আমাদের শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; তিনি ছিলেন খুব বেশী আল্লাহ অভিমুখী।"(সূরা সোয়াদ-১৭) এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত ছিল দাঊদ আ: এর সালাত এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় সাওম ছিল দাঊদ আ: এর সাওম। তিনি অর্ধারাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। [বুখারী: ১১৩১, মুসলিম: ১১৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। [বুখারী: ১৯৭৭, মুসলিম: ১১৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করতেন না, শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না।' [মুসনাদে আহমাদ:২/২০০]

মহান আল্লাহ তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন । আল্লাহ্ বলেন,

ؕ وَ اَلَنَّا لَہُ الۡحَدِیۡدَ ﴿ۙ۱۰﴾ اَنِ اعۡمَلۡ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرۡ فِی السَّرۡدِ وَ اعۡمَلُوۡا صَالِحًا ؕ اِنِّیۡ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ ﴿۱۱﴾

“আপনি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করুন(১) এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করুন। আর তোমরা সৎকাজ কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।”(সূরা সাবা:১০-১১)

এটা ছিল দাঊদ আ: এর আরেকটি মু’জিযা । সেখানে শত্রুর অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে বর্ম পরিধান করা হতো তা তৈরি করার বিশেষ নৈপুণ্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন । এই শিল্পে তাঁর বিশেষত্ব ছিল এই যে, লোহা তাঁর হাতের স্পর্শ মাত্র মোমের মত নরম হয়ে যেত । তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা বাঁকাতে পারতেন । এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এ কথাও উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যেন বর্মের কড়াসমূহের ভেতর সামঞ্জস্য রক্ষা করেন ।

✍ ইবাদতখানায় বাদী-বিবাদীর বিচার...

হযরত দাঊদ (আঃ) যেকোন ঘটনায় যদি বুঝতেন যে, এটি আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা, তাহ’লে তিনি সাথে সাথে আল্লাহর দিকে রুজু হ’তেন ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হ’তেন। এরই একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে। যেমন আল্লাহ বলেন,
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ- إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ- إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَّأَنَابَ- فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥-٢١)

“আপনার কাছে কি সেই বাদী-বিবাদীর খবর পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে দাঊদের ইবাদতখানায় ঢুকে পড়েছিল? যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল এবং দাঊদ তাদের থেকে ভীত হয়ে পড়ল, তখন তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু’জন বিবাদমান পক্ষ। আমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন । (বিষয়টি এই যে,) সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে যে, এটি আমাকে দিয়ে দাও। সে আমার উপরে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে । দাঊদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি

অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা কম। (অত্র ঘটনায়) দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও আমার দিকে প্রণত হল । অতঃপর আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের নিকটে রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল' (সূরা সোয়াদ:২১-২৫)।"

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাঊদ আ: কী ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং যা আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

✍ দাঊদ আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

হযরত দাঊদ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী ও রসূল এবং বনী ইসরাইলের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি দায়িত্বশীল নেতা, ন্যায়বিচারক, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল এক বান্দা হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত।দাঊদ (আঃ)-এর ন্যায়পরায়ণ শাসন ও বিচারব্যবস্থা আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি কখনো পক্ষপাত করতেন না এবং সবসময় সত্যের পক্ষে থাকতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যাবুর কিতাব দান করেন। এটি ছিল তাঁর জন্য বিশেষ নির্দেশনা ও শিক্ষা।

নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান ও আমানতদার হওয়া। আরও প্রয়োজন প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্নতমানের বাগ্মিতা। যার সব কয়টি গুণ হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ছিল। যে শাসক যত বেশী আল্লাহর শুকরগুজারী করেন, আল্লাহ তার প্রতি তত বেশী সদয় হন এবং ঐ রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল করেন। বস্তুতঃ দাঊদ (আঃ) সর্বাধিক ইবাদতগুজার ছিলেন এবং একদিন অন্তর একদিন সিয়াম পালন করতেন। তিনি নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এটি আমাদের শেখায়, শ্রমের মর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব। হযরত দাঊদ (আঃ)-এর জীবনী আমাদের জন্য ঈমান, কর্ম, ন্যায়বিচার, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবন থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য, এবং সৎকর্মে লিপ্ত থাকার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই, যা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ দেখায়।

☞ **রেফারেন্স:**

১.যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/২৫১; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) মায়েদাহ ৫/৭৮; (৪) আন‘আম ৬/৮৪; (৫) ইসরা ১৭/৫৫; (৬) আম্বিয়া ২১/৭৮-৮০; (৭) নমল ২৭/১৫-১৬; (৮) সাবা ৩৪/১০-১১,১৩; (৯) ছোয়াদ ৩৮/১৭-২৬= ১০; মোট ২৩টি আয়াত।

হযরত সুলাইমান আ:

সুলাইমান আ:-এর পরিচয়...

হযরত সুলাইমান আ: ছিলেন হযরত দাঊদ আ: এর পুত্র । দাঊদ আ: এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুলাইমান নবুওয়াত ও রাজত্বে তাঁর মহান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন । আল্লাহ পাক তাঁকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুয়তের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও তাঁকে এমন কিছু নে‘আমত দান করেন, যা অন্য কোন নবীকে দান করেননি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ وَہَبۡنَا لِدَاوٗدَ سُلَیۡمٰنَ ؕ نِعۡمَ الۡعَبۡدُ ؕ اِنَّہٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾

“আমি দাঊদকে দান করলাম সুলাইমান (এর মত পুত্র) । সে ছিল উত্তম বান্দা । নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী ।”(সূরা সোয়াদ:৩০)

কুরআনে তাঁর সম্পর্কে ৭টি সূরায় ৫১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।**(১)**

সুলাইমান আ:-এর বিচার দক্ষতা...

পিতা দাঊদ আ:-এর মত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কেউ আল্লাহ তা'আলা অসাধারণ বিচারদক্ষতা দান করেছিলেন । ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যে পিতা হযরত দাঊদ আ: যেভাবে বিরোধ মীমাংসা করেছিলেন, বালক সুলায়মান তাঁর চাইতে উত্তম ফায়ছালা পেশ করেছিলেন। ফলে হযরত দাঊদ আ: নিজের পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্রের দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সে মোতাবেক রায় দান করেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন,

وَ دَاوٗدَ وَ سُلَیۡمٰنَ اِذۡ یَحۡكُمٰنِ فِی الۡحَرۡثِ اِذۡ نَفَشَتۡ فِیۡهِ غَنَمُ الۡقَوۡمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شٰهِدِیۡنَ
﴿۷۸﴾ فَفَهَّمۡنٰهَا سُلَیۡمٰنَ ۚ وَ كُلًّا اٰتَیۡنَا حُكۡمًا وَّ عِلۡمًا ۫ (۷۹)

"এবং দাঊদ ও সুলাইমান কেও হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম । যখন তারা একটি শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে বিচার করছিল, তাতে রাতের বেলা একদল লোকের মেষপাল প্রবেশ করেছিল । তাদের ফায়সালা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমি সুলাইমানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতে তো) আমি উভয়কেই হিকমত ও ইলম দান করেছিলাম ।"(সূরা আম্বিয়া:৭৮-৭৯)

মুফাস্সিরগণ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তির মেষপাল রাতের বেলা অপর এক ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে ঢুকে সব ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। ক্ষেতের মালিক হযরত দাঊদ আ:-এর আদালতে মামলা দায়ের করল । দাঊদ আ: রায় দিলেন যে, মেষপালের মালিক ভুল করেছে । তার উচিত ছিল রাতে সেগুলোকে বেঁধে রাখা । কিন্তু সে তা রাখেনি । যে কারণে ক্ষেতের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব মেষপালের মালিক তার সমমূলের মেষ তাকে প্রদান করবে । এটি ছিল শরীয়তসম্মত অতি সুন্দর একটি ফয়সালা। অতঃপর এই ফায়সালা নিয়ে বাদী-বিবাদী উভয়ে যখন বের হয়ে গেল, তখন দরজার সামনে হযরত সুলাইমান আ:-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল । তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "মহান পিতা কী রায় দিয়েছেন ?" তারা তাঁকে রায় সম্পর্কে অবহিত করল । তিনি বললেন, আমার আরেকটি ফায়সালা বুঝে আসছে। যেটা উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হবে । তাঁর এই মন্তব্য যখন দাঊদ আ:-এর কানে পৌঁছলো তখন তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ফায়সালাটি কি?" সুলাইমান আ: বললেন, মেষপালের মালিক কিছুকালের জন্য তার মেষপালটি ক্ষেত মালিকের কাছে সমর্পণ করবে । ক্ষেত মালিক তা পালন করবে ও তার দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হবে । আর সে তার শস্য ক্ষেত্রটি মেষপালের মালিকের কাছে সমর্পণ করবে সে তার যত্ন নিতে থাকবে যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে অর্থাৎ মেষপাল নষ্ট করার আগে তা যে অবস্থায় ছিল, তখন মেষের মালিক ক্ষেতটিকে তার মালিকের হাতে প্রত্যার্পণ করবে এবং ক্ষেতওয়ালাও মেষপালটি তার মালিককে বুঝিয়ে দেবে । এটা ছিল এক প্রকারের আপসরফা যার ভেতর উভয়ের উপকার ছিল । তাই দাঊদ আ: তাঁর এই রায় পছন্দ করলেন এবং বললেন, "বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে।" অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। **(২)**

সুলাইমান আ:-এর মু'জিযাসমূহ...

আল্লাহ্ তাআলা যেমন দাঊদ আ:-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তাসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলাইমান আ:-এর জন্য বাতাসকে

আজ্ঞাবহ করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। তার এই মু'জিযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَ لِسُلَيۡمٰنَ الرِّيۡحَ عَاصِفَةً تَجۡرِىۡ بِاَمۡرِهٖۤ اِلَى الۡاَرۡضِ الَّتِىۡ بٰرَكۡنَا فِيۡهَا ؕ وَ كُنَّا بِكُلِّ شَىۡءٍ عٰلِمِيۡنَ ﴿۸۱﴾

"আর সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে

আর সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে এমন ভূমির দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ রেখেছি; আর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক জ্ঞানী।"(সূরা আম্বিয়া: ৮১)

উক্ত আয়াতে যে কল্যাণময় বা বরকতপূর্ণ ভূমির কথা বলা হয়েছে তা হলো শাম ও ফিলিস্তিন এলাকা । অর্থাৎ তিনি সফর করে বহু দূর-দূরান্তে চলে গেলেও বাতাস তাঁকে দ্রুত গতিতে তাঁর নিজের বরকতপূর্ণ ভূমি ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতো ।

সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে,

وَ لِسُلَيۡمٰنَ الرِّيۡحَ غُدُوُّهَا شَهۡرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهۡرٌ ۚ

"আমি বায়ুকে সুলাইমান এর অজ্ঞাধীন করে দিয়েছিলাম । তার ভোরের সফর হতো এক মাসের দূরত্বে এবং সন্ধ্যার সফরও হতো এক মাসের দূরত্বে ।"(সূরা সাবা:১২)

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে,

فَسَخَّرۡنَا لَهُ الرِّيۡحَ تَجۡرِىۡ بِاَمۡرِهٖ رُخَآءً حَيۡثُ اَصَابَ ﴿۳۶﴾

"সুতরাং আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম । যা তার আদেশে যেথায় চাইতো মন্থর গতিতে বয়ে যেত ।"(সূরা সোয়াদ: ৩৬)

এ সমস্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, সুলাইমান আ: বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে দূর-দূরান্তের সফর সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর সম্পন্ন করতেন । তার সিংহাসনকে বাতাসে উড়ে চলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল । ফলে সাধারণত যে সফর করতে এক মাস সময় ব্যয় হতো, তিনি তা এক সকাল বা এক বিকালেই অতিক্রম করতে পারতেন । তিনি তাঁর সিংহাসনে আরোহন করে বাতাসকে হুকুম দিতেন অমুক জায়গায় নিয়ে যাও। বাতাস তাঁর হুকুম মতো তাঁকে যথাস্থানে পৌঁছে দিত ।

হযরত সুলাইমান আ:-কে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আরেকটি নিয়ামত হল, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য তামার ন্যায় শক্ত পদার্থকে তরল করে দিয়েছিলেন ফলে অতি সহজেই তামার আসবাবপত্র তৈরি করা যেত ।যেমন, আল্লাহ বলেন, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ... 'আমি তার জন্য গলিত তামার একটি ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম...' (সূরা সাবা:১২)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ গলিত ধাতু উত্তপ্ত ছিল না। বরং তা দিয়ে অতি সহজে পাত্রাদি তৈরী করা যেত। সুলায়মানের পর থেকেই তামা গলিয়ে পাত্রাদি তৈরী করা শুরু হয় বলে কুরতুবী বর্ণনা করেছেন। পিতা দাঊদের জন্য ছিল লোহা গলানোর মু'জেযা এবং পুত্র সুলায়মানের জন্য ছিল তামা গলানোর মু'জেযা। আর এজন্যেই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 'হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। বস্তুতঃ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ' (সূরা সাবা:১৩)।

সুলাইমান আ:-এর আরেকটি মু'জিযা হল আল্লাহ তায়ালা জিনদেরকে তাঁর অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন । যেমন- আল্লাহ বলেন, وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّه "আর জিনের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার (সুলায়মানের) সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার (আল্লাহর) আদেশে..." (সূরা সাবা ৩৪:১২)। আরো বলা হয়েছে,

يَعْمَلُوْنَ لَہٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۳﴾

"সুলাইমান যা চাইত, তারা তার জন্য তা বানিয়ে দিত- উঁচু উঁচু ইমারত, ভাস্কর্য হাউসের মতো বড় বড় পাত্র এবং ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ ।"(সূরা সাবা:১৩)

উল্লেখ্য, ভাস্কর্যগুলো ছিল নিষ্প্রাণ বস্তুর । যেমন- গাছপালা ইমারত ইত্যাদি । তাওরাত দ্বারা জানা যায় সুলাইমান আ: এর শরীয়তেও প্রাণীর ভাস্কর্য জায়েয ছিলনা ।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ-(৮২)

"এবং আমরা তার অধীন করে দিয়েছিলাম কতক দুষ্ট জিনকেও, যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া অন্য আরও কাজ করত। আমরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতাম।" (সূরা আম্বিয়া:৮২)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ- وَآخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ-(٣٧-٣٦)

"এবং দুষ্ট জ্বীনদেরও তাঁর আজ্ঞাধীন করিয়ে দিয়েছিলাম, যার মধ্যে ছিল সব রকমের নির্মাতা ও ডুবুরি । এবং এমন কিছু জিনকেও, যারা শিকলে বাঁধা ছিল ।"(সূরা সোয়াদ:৩৬-৩৭)

বস্তুত জিনেরা সুলাইমান আ:-এর হুকুমে সাগরে ডুব দিয়ে তাঁর জন্য মনি-মুক্তা আহরণ করত । এছাড়া তারা আরো বিভিন্ন কাজ করত। তারা তাঁকে বিভিন্ন রকমের সেবা দান করত । এমনকি তারা তাঁর জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ, ভাস্কর্য, চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরী করত। সুলাইমান আ: তাদেরকে অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পাখির ভাষা বোঝার ক্ষমতা দান করেছিলেন । এছাড়া তিনি অন্যান্য জীবজন্তুর ভাষাও বুঝতেন । নবীগণের মধ্যে এটা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য । সূরা নামলে উল্লেখ রয়েছে,

وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾

"সুলাইমান দাঊদের উত্তরাধিকার লাভ করলো এবং সে বলল, হে মানুষ! আমাদেরকে পাখির বুলি শেখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহতালা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ ।"(সূরা নামল:১৬)

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে রাজত্ব দিয়েছিলেন তা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং জ্বীন ও পশু পাখির ওপরও তা ব্যাপ্ত ছিল । তিনি যখন কোন দিকে বের হতেন তখন তার সেনাদলে থাকতো যেমন মানুষ, তেমনি থাকতো জিন ও পাখির দল । এভাবে তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এত বিপুল হয়ে যেত যে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো ।

وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿۱۷﴾

"সুলাইমান এর জন্য তার সমস্ত সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল। যা ছিল জিন মানুষ ও পাখি সম্বলিত। তাদেরকে রাখা হতো নিয়ন্ত্রণে।"(সূরা নামল:১৭)

🖎 পিপীলিকার ঘটনা...

হযরত সুলাইমান আ: তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। যখন তারা পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, “ওহে পিঁপড়েরা! নিজ ঘরে ঢুকে পড়ো । পাছে সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তাদের সাথে তোমাদেরকে পিষে ফেলে ।” সুলাইমান আ: পিপীলিকাদের এই বক্তব্য শুনতে পেলেন। তিনি পিঁপড়ের এই কথায় স্মিত হেসে দিলেন এবং বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তৌফিক দাও যেন শোকর আদায় করতে পারি সেই সকল নেয়ামতের, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং করতে পারি এমন সৎ কাজ, যা তুমি পছন্দ করো আর নিজ রহমতে তুমি আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো ।”(সূরা নামল:১৮-১৯)

🖎 সাবার রাণী বিলকিস এর ঘটনা...

সুলাইমান আ: এর দরবারে মানুষ ছাড়াও বহু জীব জন্তু এবং জ্বীন খিদমতের জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকতো । তারা নিজেদের মর্যাদা ও অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে অকুণ্ঠ ও দ্বিধাহীন চিত্তে আজ্ঞাবহ থাকতো । একবার তিনি তাঁর দরবারে পাখিদের খোঁজখবর নিলেন । কিন্তু হুদহুদ নামক পাখিটিকে দেখতে না পেয়ে তিনি বললেন, “কী ব্যাপার! হুদহুদকে দেখছি না যে, সে কি অনুপস্থিত নাকি?” সে যদি সত্যিই অনুপস্থিত হয়ে থাকে, তবে তার এই অহেতুক অনুপস্থিতির জন্য অবশ্যই সে শাস্তির যোগ্য । সুতরাং আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা তাকে জবাই করে ফেলব। যদি না সে আমার কাছে কোন স্পষ্ট কারণ দর্শাতে পারে ।” তার কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ দরবারে এসে উপস্থিত হল । তার দেরি হওয়ার কারণ সম্পর্কে সুলাইমান আ: জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, “আমি এমন বিষয়ে জেনেছি যা আপনার জানা নেই আমি আপনার কাছে সাবা দেশ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি । আমি সেখানে এক নারীকে সেখানকার লোকদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি । তাকে সর্বপ্রকার আসবাব-উপকরণ দেওয়া হয়েছে আর তার একটি বিরাট সিংহাসনও আছে । আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সিজদা করছে । শয়তান তাদের কাছে তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দেখিয়েছে । এভাবে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ফলে তারা হিদায়াত পাচ্ছে না । সে তাদেরকে নিবৃত্ত রেখেছে যাতে তারা আল্লাহকে সিজদা না করে ।”

হুদহুদের এই কথা শুনে সুলাইমান আ: বললেন, "আমি এখনই দেখছি তুমি সত্য বলেছ নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন হয়ে গেছো ।" তারপর তিনি হুদহুদকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, আমার এই চিঠি নিয়ে যাও । এটি তাদের সামনে ফেলে দেবে তারপর তাদের থেকে সরে যাবে এবং লক্ষ্য করবে তারা এর জবাবে কী করে । অতঃপর হুদহুদ সুলাইমান আ:-এর আদেশ অনুযায়ী চিঠিটি রানীর সামনে ফেলে দিয়ে আসলো ।

তখন রানী তার দরবারে লোকদেরকে বলল, হে জাতির নেতৃবর্গ! আমার সামনে একটি মর্যাদা সম্পন্ন চিঠি ফেলা হয়েছে । তা এসেছে সুলাইমান এর পক্ষ থেকে । তা শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রহমান ও রহীম । তাতে তিনি লিখেছেন, আমার উপর অহমিকা দেখিও না । বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো । চিঠিটি পড়া শেষে রানী তার সভাসদদেরকে বলল, "ওহে জাতির নেতৃবৃন্দ! যে সমস্যাটি আমার সামনে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্ত মূলক পরামর্শ দাও। আমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে উপস্থিত থাকো ।" সভাসদগণ বলল, "আমরা শক্তিশালী লোক এবং প্রচন্ড লড়াকু। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনার । সুতরাং ভেবে দেখুন কি হুকুম দেবেন ।" তখন রানী বলল, "প্রকৃত ব্যাপার হলো রাজা-বাদশাগণ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে জেরবার করে ফেলে এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে । এরাও তো তাই করবে । আমি বরং তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো তারপর দেখব দূতেরা কি উত্তর নিয়ে ফেরে । "

সম্ভবত নবুয়াতি পত্রের অসামান্য শক্তি রানী বিলকিসের অন্তরে অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল । পত্রের এতটা শৌর্য যে কেবল রাজকীয় বলবত্তা থেকে উচ্চারিত নয় বরং এর উৎস অন্য কোথাও, সেরকম কিছু হয়তো তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন । সেই বোধ থেকেই তিনি উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে সুলাইমান আ:-কে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে তিনি সেগুলো কবুল করেন কিনা । কবুল করলে বোঝা যাবে তিনি কেবলই একজন রাজা এবং রাজাদের মতোই অর্থ ও ক্ষমতার মোহ দ্বারা তিনি চালিত । তা যদি হয় তবে তার সাথে বোঝাপড়া করার সুযোগ থাকবে । আর তিনি যদি তা প্রত্যাখ্যান করেন তবে বুঝতে হবে তিনি পার্থিব লোভ লালসার ঊর্ধ্বে এবং কোন ঐশ্বরিক যোগাযোগ তার মধ্যে ক্রিয়াশীল । সেক্ষেত্রে নিঃশর্ত আনুগত্য করাই হবে সুবুদ্ধির পরিচায়ক ।

তারপর দূত যখন রানীর পাঠানো উপঢৌকন নিয়ে সুলাইমান আ:-এর কাছে উপস্থিত হলো, তখন সুলাইমান আ: বললেন, "তোমরা কি অর্থ দ্বারা আমার সাহায্য করতে চাও? বস্তুত আল্লাহ

আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট । অথচ তোমরা তোমাদের উপহার সামগ্রী নিয়ে উৎফুল্ল । তোমরা ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের কাছে এমন এক সেনাদল নিয়ে আসব যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেব । আর তারা হয়ে যাবে অবনমিত ।"

সুলাইমান আ: ওহীর মাধ্যমে অবগত হলেন যে, সাবার রানী তাঁর দরবারে হাজির হবেন । তিনি মূলত রানীর সামনে একটা মু'জিযা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন । এজন্য তিনি রানীর সিংহাসনটিকেই বেছে নেন। রানী এসে পৌছার আগেই যদি তার বিশাল সিংহাসনটি সুলাইমান আ: এর দরবারে হাজির হয়ে যায় তবে এক অলৌকিক কান্ড হিসেবে তা রানীকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে এবং তাঁর নবুওয়াতের শক্তি ও সত্যতা তার সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। তাই তিনি আদেশ করলেন, ওহে দরবারীগণ! কে আছে তোমাদের মধ্যে, যে তারা বশ্যতা স্বীকার করে আসার আগেই আমার কাছে তার সিংহাসন নিয়ে আসবে? তখন এক বলিষ্ঠদেহী জ্বীন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি সেটি আপনার কাছে নিয়ে আসব। নিশ্চয়ই আমি এ কাজের সক্ষম এবং বিশ্বস্ত । এই

কথা শুনে (কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে) স্বয়ং সুলাইমান আ: বা তাঁর মন্ত্রী বললেন, তুমি তো দরবার শেষ হওয়ার কথা বলছ, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আমি চোখের পলক ফেলার আগেই তা এখানে নিয়ে আসতে পারি । এরপর সুলাইমান আ: মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেলেন, সাবার রানীর সিংহাসনটি তাঁর সামনে বিদ্যমান । তখন তিনি বলে উঠলেন, "এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ । তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করি না অকৃতজ্ঞতা করি । যে কেউ কৃতজ্ঞতা আদায় করে সে তো তা আদায় করে নিজেরই উপকারার্থে । আর কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে আমার প্রতিপালক তো ঐশ্বর্যশালী মহানুভব ।" অতঃপর তিনি তার অনুচরদেরকে বললেন, "তোমরা রানীর সিংহাসনটিকে তার পক্ষে অচেনা বানিয়ে দাও। আমি দেখতে চাই সে এটা চিনতে পারি কিনা নাকি সে যারা সত্যে উপনীত হতে পারে না তাদের অন্তর্ভুক্ত?"

তারপর যখন সাবার রানী তাঁর দরবারে হাজির হলো, সুলাইমান আ: তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সিংহাসনটি কি এরকম? রানী বিলকিস বুঝে ফেললেন সিংহাসনটির আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে । সে বলল, এটি যেন সেটিই। আমাদের তো এর আগেই আপনার সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এবং আপনার আনুগত্য ও স্বীকার করেছিলাম । অর্থাৎ আপনার দূত মারফত আপনার যে খবরা-খবর পেয়েছিলাম তা দ্বারা আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম আপনি একজন সত্য নবী এবং তখনই আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনার আনুগত্য স্বীকার করব । আসলে রানীর মুশরেকি জীবন ও সূর্যপূজা সুলাইমান আ:-এর পয়গামের

যথাযথ অর্থ বুঝতে পারার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । অতঃপর সুলাইমান আ: তাঁর উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য একটি সূক্ষ্ম কণ্ঠ অবলম্বন করলেন।

তিনি দুনিয়াপ্রেমী লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে একজন কালো শিশমহল নির্মাণ করেছিলেন । তার সামনের চত্বরে ছিল একটি জলাশয়। যার উপর স্বচ্ছ সীসার ছাদ ঢালাই করে দিয়েছিলেন। গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে সীসার ছাদটি চোখে পড়তো না । সরাসরি পানির ওপরে নজর পড়তো এবং মনে হতো সেটি একটি উন্মুক্ত জলাশয় । মহলে সে জলাশয়ের উপর দিয়েই প্রবেশ করতে হতো । রানীকে বলা হলো, এই মহলে প্রবেশ করো। সুতরাং সাবার রানী বিলকিস যখন তাদের প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে চললেন, সামনে সেই জলাশয়টি পড়ল। সেটি যেহেতু গভীর ছিল না তাই তিনি এগিয়ে যেতে থাকল। আর যাতে পরিধানের কাপড় ভিজে না যায় তাই সে কাপড় উচিয়ে নিজ গোছা খুলে ফেলল। তখন সুলাইমান আ: তাকে বললেন, “কাপড় উচানোর দরকার নেই । এটাতো স্বচ্ছ সীসার ঢালাইকৃত মহল । তাই এর উপর দিয়ে গেলে ভেজার কোন আশঙ্কা নেই ।”
রানী তো আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, সুলাইমান আ: সত্য নবী। তারপর যখন এই জমকালো শিশমহল দেখলেন তখন এই ভেবে অভিভূত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াতের সাথে সাথে দুনিয়ার দিক থেকেও তাকে কতটা শান-শওকত দান করেছেন। ফলে কালক্ষেপন না করে সে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করল। রানী বলল, “হে আমার প্রতিপালক! বস্তুত আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি এক্ষণে আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম ।”

উল্লেখ্য, সাবা একটি জাতির নাম । ইয়ামানের একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করত । সে জাতির নাম অনুসারে অঞ্চলটিকে সাবা বলা হতো। সাবা রাজত্বের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল আরবের দক্ষিণাংশের ইয়ামানের পূর্বাঞ্চল । হযরত সুলাইমান আ:-এর রাজত্বকালে এক রানী সে দেশ শাসন করতো । ঐতিহাসিক বর্ণনা সমূহে তার নাম বলা হয়েছে “বিলকিস” ।

অশ্ব কুরবানি...

পিতা দাঊদের ন্যায় পুত্র সুলায়মানকেও আল্লাহ বারবার পরীক্ষায় ফেলেছেন তাঁকে সর্বদা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল রাখার জন্য। ফলে তাঁর জীবনের এক একটি পরীক্ষা এক একটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কুরআন সেগুলির সামান্য কিছু উল্লেখ করেছে, যতটুকু আমাদের

উপদেশ হাসিলের জন্য প্রয়োজন। আলোচ্য অশ্ব কুরবানীর ঘটনাটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ :

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ- فَقَالَ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ- رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ-

"যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল। তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রভুর স্মরণের জন্যই ঘোড়াগুলিকে মহববত করে থাকি (কেননা এর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হয়ে থাকে। অতঃপর সে ঘোড়াগুলিকে দৌড়িয়ে দিল) এমনকি সেগুলি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। (অতঃপর সে বলল,) ঘোড়াগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে তাদের গলায় ও পায়ে (আদর করে) হাত বুলাতে লাগল।" (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩১-৩৩)

উপরোক্ত তরজমাটি ইবনু আববাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে ইবনু জারীরের গৃহীত ব্যাখ্যার অনুকূলে করা হয়েছে। মুফাসসীদের বড় একটি দল আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাতে বলা হয়েছে ঘোড়া পরিদর্শনে মগ্ন থাকার কারণে তাঁর সালাত কাযা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ঘোড়াগুলোকে কুরবানী করে দেন । বস্তুত ঘোড়াগুলো তাঁর জন্য ছিল পরীক্ষা স্বরূপ । সুলাইমান আ: আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরও একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন যা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ(٣٤)

"অবশ্যই আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনে একটি নিষ্প্রাণ দেহ এনে ফেলে দিয়েছিলাম । অনন্তরাও সে(আল্লাহর) অভিমুখী হল ।"(সূরা সোয়াদ:৩৪)

এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা কেবল এতটুকুই। এক্ষণে সেই নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল, একে সিংহাসনের উপর রাখার হেতু কি ছিল, এর মাধ্যমে কি ধরনের পরীক্ষা হল- এসব বিবরণ কুরআন বা সহীহ হাদীসে কিছুই বর্ণিত হয়নি।

🖎 হাদিসে বর্ণিত সুলাইমান আ: এর একটি ঘটনা...

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে সুলাইমান আ: সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম এই যে, একবার হযরত সুলায়মান (আঃ) এ মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, রাত্রিতে আমি (আমার ৯০ বা ১০০) সকল স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটি করে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও পরে তারা আল্লাহর পথে ঘোড় সওয়ার হয়ে জিহাদ করবে। কিন্তু এ সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' (অর্থঃ 'যদি আল্লাহ চান') বলতে ভুলে গেলেন। নবীর এ ত্রুটি আল্লাহ পসন্দ করলেন না। ফলে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ল'।**(৩)** এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সুলায়মান বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হ'লেও এবং জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও সকল জীবজন্তু তাঁর হুকুম বরদার হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অতএব তাঁর 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে যাওয়াটা ছোটখাট কোন অপরাধ নয়।

🖎 হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের কাহিনী...

সুলাইমান আ:-এর আমলে কিছু শয়তান, যাদের মধ্যে জিন ও মানুষ উভয়ে থাকতে পারে, কতক ইহুদিকে ফুসলানী দিল যে সুলাইমান আ: কোন নবী নন । তাঁর রাজত্বের সকল রহস্য যাদুর মধ্যে নিহিত । তোমরা যদি জাদু শিক্ষা করো তবে তোমাদেরও বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জিত হবে । সুতরাং তারা জাদুর তালিম নিতে ও তা কাজে লাগাতে শুরু করে দিল। অথচ জাদু শেখা যে কেবল অবৈধ ছিল তাই নয় বরং তার কোন কোন পদ্ধতি ছিল কুফরি পর্যায়ের । সুলায়মান (আঃ) যে সত্য নবী, তিনি যে জাদুকর নন, জনগণকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীগণের মু'জেযা ও শয়তানদের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে 'বাবেল' শহরে মানবাকৃতিতে পাঠিয়ে দেন। 'বাবেল' ছিল ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগর । তৎকালে সেটি ছিল যাদুবিদ্যার কেন্দ্রস্থল ।

মুজিযা তো সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাজ। বাহ্যিক কোনো কারণ দ্বারা তার সৃষ্টি হয় না । পক্ষান্তরে জাদু দ্বারা যেসব ভোজ-বাজি দেখানো হয় তা ইহজাগতিক আসবাব উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় । এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ফেরেশতাদ্বয়কে জাদুর বিভিন্ন পদ্ধতি ও বর্ণনা করতে হতো, যাতে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তা কিভাবে কার্যকারণ সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত । তবে তারা যখন সেসব পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতেন, তখন মানুষকে সাবধান করে দিতেন যে, স্মরণ রেখো, তোমরা যাদুর এসব পদ্ধতিকে কাজে লাগাবে বলে কিন্তু এসব তোমাদের সামনে

বর্ণনা করছি না বরং যাতে জাদু ও মু'জিযার পার্থক্য তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তোমরা জাদু থেকে বেঁচে থাকতে পারো। এই উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করছি । কিন্তু অবাধ্য লোকেরা তাদের কথায় কর্ণপাত তো করলোই না, উল্টো তাদের শেখানো পদ্ধতিগুলোকে জাদু করার কাজে ব্যবহার করল। যেমন- স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا واتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-(١٠٢)

"(ইহুদী-নাছারাগণ) ঐ সবের অনুসরণ করে থাকে, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। অথচ সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার উপরে যা নাযিল হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। বস্তুতঃ তারা (হারূত-মারূত) উভয়ে একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা এসেছি পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তুমি (জাদু শিখে) কাফির হয়ো না। কিন্তু তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা তারা কারু ক্ষতি করতে পারত না। লোকেরা তাদের কাছে শিখত ঐসব বস্তু যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের কোন উপকার করে না। তারা ভালভাবেই জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করবে, তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো। যদি তারা ঈমান আনত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত, যদি তারা জানত।" (সূরা বাক্বারাহ ২:১০২-১০৩)

✎ বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ ও সুলাইমান আ: এর ইন্তিকাল এর বিস্ময়কর ঘটনা...

হযরত সুলাইমান আ: বায়তুল মুকাদ্দাস এর নির্মাণ কাজে জ্বীনদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন । জ্বীনগুলো ছিল অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির ও অবাধ্য । তারা কেবল সুলাইমান আ:-এর তত্ত্বাবধানেই কাজ করতো । অন্য কাউকে মানতো না । তাই আশঙ্কা ছিল সুলাইমান আ: এর জীবদ্দশায় যদি বাইতুল মুকাদ্দাস এর নির্মাণ কাজ শেষ না হয় তবে পরে এ কাজ সম্পূর্ণ করা প্রায়

অসম্ভব হয়ে যাবে । কেননা তখন জ্বীনরা কাজ করা ছেড়ে দেবে । এদিকে তাঁর আয়ুও শেষ হয়ে গিয়েছিল । কাজেই তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন, তার মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন তিনি জ্বীনদের চোখের সামনে নিজ ইবাদত খানায় একটি লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন । যাতে তারা মনে করে তিনি যথারীতি তদারকি করছেন তাঁর ইবাদত খানা ছিল স্বচ্ছ কাচ নির্মিত যার বাইরে থেকে সব দেখা যেত । দাঁড়ানো অবস্থায় তার ওফাত হয়ে গেল । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে লাঠিতে ভররত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন । জ্বীনরা মনে করছিল তিনি জীবিতই আছেন এবং তদারকি করছেন । কাজেই তারা একটানা কাজ করতে থাকলো এবং একসময় নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়ে গেল । ইত:মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিলেন। তারা লাঠিটি খেতে থাকল । ফলে একসময় সেটি দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ল এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জ্বীনরা বুঝতে পারল যে, বহুকাল পূর্বেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে এবং নিজেদের অজ্ঞতার জন্য আফসোস করতে লাগলো ।

উক্ত ঘটনাটি কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-(١٤)

“অতঃপর আমি যখন সুলাইমানের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিলাম তখন জ্বীনদেরকে তার মৃত্যুর বিষয়ে জানালো কেবল মাটির পোকা, যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। সুতরাং যখন সে পড়ে গেল তখন জ্বীনরা বুঝতে পারল, তারা যদি গায়েবের জ্ঞান রাখতো তবে এই লাঞ্ছনাকর কষ্টে পড়ে থাকত না ।”(সূরা সাবা:১৪)

✐ সুলাইমান আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

সুলাইমান আ: ছিলেন আল্লাহর একজন প্রিয় নবী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি দাউদ আ: এর পুত্র এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান, ক্ষমতা ও সম্পদ প্রাপ্ত ছিলেন। সুলাইমান আ: এর রাজত্ব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ। তাঁর শাসন শুধু মানুষ নয়, বরং জিন, পশু-পাখি এবং প্রকৃতির ওপরও বিস্তৃত ছিল। এত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের সব অর্জনকে আল্লাহর দান হিসেবে বিবেচনা করতেন। সুলাইমান আ: এর ন্যায়বিচার ছিল তাঁর শাসনের মূল ভিত্তি। সুলাইমান আ: তাঁর বিশাল ক্ষমতা কখনোই ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করেননি। বরং

আল্লাহর পথে এবং মানুষের কল্যাণে তা কাজে লাগিয়েছেন। তিনি পশুপাখি ও জ্বিনদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা পেয়েছিলেন ।

☞ রেফারেন্স:

১.যথাক্রমে (১) সূরা বাক্বারাহ ২/১০২; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) আন‘আম ৬/৮৪;
(৪) আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯, ৮১-৮২; (৫) নমল ২৭/১৫-৪৪=৩০; (৬) সাবা ৩৪/১২-১৪; (৭) ছোয়াদ ৩৮/৩০-৪০=১১; মোট ৫১টি আয়াত।
২. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন
৩.মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২০ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ-৯।

হযরত ইলিয়াস আ:

✍ ইলিয়াস আ: এর পরিচয়...

পবিত্র কুরআনে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা দেখা যায়। সূরা আন'আম ৮৫ আয়াতে ও সূরা ছাফফাত ১২৩-১৩২ আয়াতে। সূরা আন'আমে ৮৩-৮৫ আয়াতে ১৮ জন নবীর তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। সেখানে কোন আলোচনা স্থান পায়নি। তবে সূরা সাফফাতে সংক্ষেপে হলেও তাঁর দাওয়াতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনায় এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে, তিনি হযরত হিযক্বীল আ:-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াসা' আ:-এর পূর্বে দামেস্কের পশ্চিমে বা'লা বাক্কা (بعلبك) অঞ্চলের বনু ইসরাইলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

✍ ইলিয়াস আ: এর দাওয়াত...

কুরআন মাজীদে হযরত ইলিয়াস আ:-এর সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ইসরাইলি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলাইমান আ:-এর পর বনী ইসরাইল ব্যাপকভাবে কুফর ও শেরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে । তখন তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত ইলিয়াস আ:-কে পাঠানো হয় । ইলিয়াস আ: ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُوْنَ- أَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ- اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ- فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ- إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ- سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ-

"নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম । যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি ভয় কর না? তোমরা কি বা'ল দেবতার পূজা করবে আর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে ? যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা । অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে । কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত । আমরা এই নিয়মের উপরে পরবর্তীদেরকেও রেখে দিয়েছি । ইলিয়াস-এর উপরে শান্তি বর্ষিত হোক । এভাবেই আমরা সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি । নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সাফফাত:১২৩-১৩২)

বিগত নবীগণের যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইলিয়াস আ:-এর ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বনী ইসরাইলের শাসক আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'ল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং এক আল্লাহর প্রতি ইবাদতের আহবান জানালেন। কিন্তু দু'একজন হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা ইলিয়াস আ:-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হ'ল। তাকে যত্রতত্র অপমান-অপদস্থ করা শুরু করল। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ইলিয়াস (আঃ) তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে রাজা ও রাণী তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন । আল্লাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের উপর বালা-মুসিবত চাপিয়ে দিলেন । আর হযরত ইলিয়াস আ:-কে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। ইসরাইলি ঘটনায় আরো পাওয়া যায়, তাঁকে আসমানে জীবিত তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত বা সমর্থিত নয় ।

✐ বা'ল দেবতার পরিচয়...

সূরা সাফফাত ১২৫ নং আয়াতে যে বা'ল (بعل) দেবতার কথা বলা হয়েছে, আরবী ভাষায় এর অর্থ স্বামী বা মালিক। কিন্তু সম্ভবতঃ এটি হিব্রু শব্দ। কেননা তখনকার সময় ফিলিস্তীন অঞ্চলের ভাষা ইবরানী বা হিব্রু ছিল। এটি ইস্রাঈলীদের পূজিত দেবমূর্তির নাম। হযরত মূসা আ:-এর সময়ে শাম অঞ্চলে এর পূজা হ'ত এবং এটাই ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। বা'ল বাক্কা (بعلبك) শব্দটি مركب بنائى বা অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দের উদাহরণ হিসাবে আরবী ব্যাকরণের একটি অতি পরিচিত শব্দ। এটি লেবাননের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যা উক্ত বা'ল দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারো কারো মতে জাহেলী আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি 'হুবাল' (هبل) এই বা'লেরই অপর নাম।

✐ শিক্ষনীয়...

হযরত ইলিয়াস আ. এবং তাঁর কওমের ঘটনা যদিও কুরআন মাজিদে খুব সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, তথাপি এতে শিক্ষণীয় ব্যাপার হল, বনি-ইসরাঈল বংশীয় ইহুদিদের মনোবৃত্তি এ পর্যায়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল- দুনিয়ার মধ্যে এমন কোনো মন্দকাজ ছিল না, যা করার জন্য এরা লালায়িত ছিল না। এবং কোনো ভালো কাজ ছিল না, যার প্রতি তারা আকৃষ্ট হত। আর নবী ও রাসূলদের এক সুদীর্ঘ ও অবিরত ধারা সত্ত্বেও মূর্তিপূজা এবং জড়পদার্থের পূজা, নক্ষত্রপূজা মোটকথা, গায়রুল্লাহর পূজার কোনো শাখাই এমন ছিল না, যার পূজারী এরা হয়

নি। অতএব, কুরআন মাজিদে বনি ইসরাইল সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনায় তাদের দুর্ভাগ্য এবং বক্রগতির উপর আলোকপাত হয়, সেখানেই আমাদের এ উপদেশ ও নসিহত লাভ হয়।

তাঁর জীবনী থেকে আরও লক্ষ্যণীয়, শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন ইস্রাঈলের রাণী ইযবীলের মাধ্যমে বা'ল মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল। পরে সারা দেশে তা চালু হয়ে যায়। এবং সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিকে আপোষহীনভাবে স্রেফ আল্লাহর উপরে ভরসা করে তাওহীদ বিরোধী কাজের সংস্কারে নামতে হয়। যেভাবে ইলিয়াস আ: একাকী উক্ত কাজে নেমেছিলেন।

হযরত আল-ইয়াসা আ:

✍ আল-ইয়াসা আ:-এর পরিচয়...

পবিত্র কুরআনে অন্যান্য নবীগণের সাথে এই নবীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায় । তাঁর সম্পর্কে কুরআনে কোন ধরনের বর্ণনা আসেনি বরং শুধু তাঁর নামই উল্লেখ রয়েছে । পবিত্র কুরআনে এই নবী সম্পর্কে অন্য নবীগণের নামের সাথে সূরা আন'আম ৮৬ ও সূরা সোয়াদ ৪৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে । সূরা আন'আম ৮৩ হ'তে ৮৬ আয়াত পর্যন্ত ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা' সহ ১৭ জন নবীর নামের শেষদিকে বলা হয়েছে-

وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطاً وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ (٨٦)

"ইসমাঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস, লূত্ব তাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি ।" (সূরা আন'আম ৬:৮৬)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ-(٤٨)

"আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা সোয়াদ ৩৮:৪৮)

উক্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আল-ইয়াসা' আ: নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আল-ইয়াসা ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ: এর চাচাতো ভাই । ইবনে আসাকির তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আল ইয়াসা আ:-এর বংশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব-এর বংশধর ছিলেন।

✍ নবুয়্যত...

হযরত আল-ইয়াসা আ: ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ: এর স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি । হযরত ইলিয়াস আ: সুলায়মান আ: পরবর্তী পথভ্রষ্ট বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলদের হেদায়েতের জন্য আল-ইয়াসা আ: কে

নবুওয়াতের সম্মানে সম্মানিত করেন । এবং তিনি ইলিয়াস আ:-এর শরী'আত অনুযায়ী ফিলিস্তীন অঞ্চলে জনগণকে পরিচালিত করেন ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।**(১)**

ইসহাক ইবনে বিশর আবু হুজাইফা, হাসান রা: সূত্রে বর্ণনা করেন, ইলিয়াস আ:-এর পরে আল-ইয়াসা আ: ছিলেন বনী ইসরাইলের নবী । তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে অবস্থান করেন। বনী ইসরাঈলকে তিনি আল্লাহর অনুগত্য করার ও ইলিয়াস আ:- এর শরীয়তের অনুবর্তী হওয়ার আহ্বান জানান । মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যান ।

☞ রেফারেন্স:

১.আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪ পৃঃ।

হযরত যুলকিফল আ:

✍ যুলকিফল আ:-এর পরিচয়...

পবিত্র কুরআনে হযরত যুলকিফল আ: এর নাম ছাড়া অন্য কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কুরআনে অন্যান্য নবী-রাসুলগণের জীবনের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হলেও তাঁর জীবনের কোন ঘটনাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও তাঁর সম্পর্কে কিছু বর্ণিত নেই । পবিত্র কুরআনে কেবল সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ ও সূরা সোয়াদ ৪৮নং আয়াতে যুলকিফল আ: এর নাম এসেছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ- وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- (الأنبياء-৮৫-৮৬)

“আর তুমি স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল ছবরকারী’। ‘আমরা তাদেরকে আমাদের রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।” (আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ-

“আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘ ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত।” (ছোয়াদ ৩৮:৪৮)।

কুরআনের এসব আয়াতে উল্লেখিত মহান নবীগণের সাথে যুলকিফলের নাম ও প্রশংসা একত্রে উল্লেখ থাকায় স্পষ্টত বোঝা যায়, তিনিও নবী ছিলেন । তাঁর সম্পর্কে এ মতই প্রসিদ্ধ । কারো কারো ধারণা, তিনি নবী ছিলেন না । বরং তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক । কোন কোন মুফাসসির তাঁকে হযরত আল-ইয়াসা আ:-এর খলিফা বলেছেন । আবার কারো মতে তিনি একজন ওলী ছিলেন ।

ইবনু জারীর ও ইবনে আবী হাতিম রহ. মুজাহিদ রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইয়াসা আ: যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি লোকজনদেরকে জড়ো করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে তিনটি কাজ করার অঙ্গীকার করবে? তাকে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করব । কাজ তিনটি এই: ১. দিনে সিয়াম পালন করবে, ২. রাত জেগে ইবাদত করবে এবং ৩. কোন অবস্থায় রাগান্বিত হতে পারবেনা

। এ ঘোষণা শোনার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি পারবো । তিনি সম্ভবতঃ তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই পরের দিন আবার সমাবেশ আহবান করলেন এবং সকলের সম্মুখে পূর্বোক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। আজও সবাই নীরব রইলো এবং সেই লোকটি দাঁড়িয়ে বললো, আমি পারবো । তখন আল-ইয়াসা‘ আ: উক্ত ব্যক্তিকেই তাঁর খলীফা নিযুক্ত করলেন, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নবুয়তী মিশন চালিয়ে নিবেন এবং মৃত্যুর পরেও তা অব্যাহত রাখবেন। বলা বাহুল্য, উক্ত ব্যক্তিই হ’লেন ‘যুলকিফল’ (দায়িত্ব বহনকারী), পরবর্তীতে আল্লাহ যাকে নবুয়ত দানে ধন্য করেন (কুরতুবী, ইবনু কাছীর)।

✍ যুলকিফল আ: এর পরীক্ষা...

যুল-কিফল’ উক্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠল। সে তখন তার বাহিনীদেরকে ডেকে বলল, ওই ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করার দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে । কিন্তু তারা সকলে তাতে ব্যর্থ হল । তখন ইবলীস নিজে সেই দায়িত্ব নিল । যুলকিফল সারা রাত্রি সালাতের মধ্যে অতিবাহিত করার কারণে মাত্রই দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। ইবলীস তাঁকে রাগানোর জন্য ঐ সময়টাকেই বেছে নিল। একদিন সে ঠিক দুপুরে এক বৃদ্ধ দরিদ্রের বেশে তাঁর নিদ্রার সময় এসে দরজার কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দরজায় কে? উত্তর এল, আমি একজন বৃদ্ধ মযলূম। তিনি দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে এসে তার উপরে যুলুমের দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা শুরু করল। এভাবে ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে দুপুরে নিদ্রার সময়টা পার করে দিল। যুলকিফল তাকে বললেন, সন্ধ্যার পর আমি যখন দরবারে বসবো, তখন এসো। আমি তোমার উপরে যুলুমের বিচার করে দেব। বৃদ্ধ চলে গেল ।

যুলকিফল যখন সন্ধ্যার পর দরবারে গেলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সে এলো না। পরের দিন সকালেও তিনি তার জন্য অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সে এলো না। কিন্তু দুপুরে যখন তিনি কেবল নিদ্রা গেছেন, ঠিক তখনই এসে কড়া নাড়ল। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আদালত কক্ষে মজলিস বসার পর এসো। কিন্তু তুমি কালও আসনি, আজও সকালে আসলে না। তখন লোকটি ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের পানি ফেলে বিরাট কৈফিয়তের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করল। সে বলল, হুযুর! আমার বিবাদী খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক। আপনাকে আদালতে বসতে দেখলেই সে আমার হোক আদায় করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আপনি চলে গেলেই সে তা প্রত্যাহার করে নেয়। বৃদ্ধের সাথে কথা বলতে বলতে আজও তার দুপুরের নিদ্রা আর হলো না ।

তৃতীয় দিন দুপুরে তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরিবারের সবাইকে বললেন, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি এখন ঘুমাবো । আমি ঘুমিয়ে গেলে কেউ যেন দরজার কড়া না নাড়ে। বৃদ্ধ সেদিন এলো এবং কড়া নাড়তে চাইল। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাকে বাধা দিল। তখন সে সবার অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং এবার ভিতরের দিক থেকে দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি শুরু করল। এতে যুলকিফলের ঘুম ভেঙ্গে গেল । তিনি বললেন, ওহে! আমি কি তোমায় এ সময় আসতে বারণ করিনি? সে বলল, আমি আমার নিজ প্রচেষ্টায় এসেছি । আপনি তো আমাকে আসতে দেননি । লক্ষ্য করে দেখুন আমি কিভাবে এসেছি । দেখলেন সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি বুঝে ফেললেন যে, এটা শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহ'লে আল্লাহর দুশমন ইবলীস? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। প্রত্যেকবারই আপনি আমাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন । আপনাকে রাগান্বিত করার জন্যই আমি এসব করেছি । আমি চেয়েছিলাম, যাতে আল-ইয়াসা নবীর সাথে আপনার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। আর সে উদ্দেশ্যেই আমি এতসব কান্ড ঘটিয়েছি। কিন্তু অবশেষে আপনিই বিজয়ী হলেন।

এই ঘটনার কারণেই তাঁকে 'যুল-কিফল' (ذو الكفل)। উপাধি দেওয়া হয়। যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি । কেননা তিনি যে কাজ করার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ করেছেন ।

যুলকিফল আ: একজন ন্যায়পরায়ণ ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনেও তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ধৈর্যশীলদের উদাহরণ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন ।

হযরত যাকারিয়া আ:

✍ যাকারিয়া আ: এর পরিচয়...

হযরত যাকারিয়া আ: ছিলেন সুলাইমান আ: পরবর্তী বনি ইসরাইলের নবী । যাকারিয়া (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারইয়াম আ: এর লালন-পালনকারী ছিলেন।

✍ হযরত মারইয়াম এর তত্ত্বাবধানে যাকারিয়া আ:...

এ বিষয়ে আল্লাহ সূরা আলে-ইমরানে যা বলেন, তার সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমরান ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমাম । তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হান্না । তার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না । তাই তাঁর স্ত্রী মানত করেছিলেন তার কোন সন্তান হলে তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস এর খেদমত করার জন্য উৎসর্গ করবেন। তারপর হযরত মারইয়াম এর জন্ম হলো । তিনি হয়তো ভেবেছিলেন তার পুত্র সন্তান হবে কিন্তু যখন পুত্রের স্থলে কন্যা জন্ম নিল তখন তিনি হতাশ হয়ে গেলেন । উপরন্ত মারইয়াম এর জন্মের আগেই তার পিতার ইন্তেকাল হয়ে যায় । এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির অভিভাবক হতে চায়। হযরত যাকারিয়া আ: ছিলেন হান্নার ভগ্নিপতি এবং হযরত মারইয়াম এর খালু । অতএব মারইয়ামের তত্ত্বাবধান কাকে দেওয়া হবে এ ব্যাপারে মীমাংসা করার জন্য লটারি করা হলো । সেই লটারিতে জাকারিয়া আ:-এর নাম উঠলো। এই ঘটনাটি আল্লাহ্ তাআলা তার শেষ নবীকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ-(٤٤)

“(মারইয়াম এর বিষয়টি) হল গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে প্রত্যাদেশ করছি। আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা লটারীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করছিল এ ব্যাপারে যে, কে মারিয়ামকে প্রতিপালন করবে? আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল” (সূরা আলে ইমরান:৪৪)

মারইয়াম মসজিদ সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া আ: তাঁকে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি তাঁর ইবাদত খানায় আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য-খাবার দেখতে পেতেন। আল্লাহর কুদরতে তিনি সেগুলো লাভ করতেন । যাকারিয়া আ: তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মারইয়াম! তোমার কাছে এসব জিনিস কোথা থেকে আসে? মারইয়াম বললেন, আল্লাহ পাকের তরফ হতে ।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

...وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا الۡمِحۡرَابَ ۙ وَجَدَ عِنۡدَهَا رِزۡقًا ۚ قَالَ يٰمَرۡيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

"এবং তিনি তাকে যাকারিয়্যার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়্যা তার কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। তিনি বলতেন, হে মারইয়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে? (মারইয়াম) বলতেন, তা আল্লাহর নিকট হতে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযক দান করেন।"(সূরা আল-ইমরান:৩৭)

✍ সন্তান জন্মের সুসংবাদ...

যাকারিয়া আ: তখনো পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। সময়ও ছিল বার্ধক্যের- যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে আল্লাহর শক্তি-সামর্থের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার আল্লাহর মহিমা ইতিপূর্বে তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু এসময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মারইয়ামকে ফল দান করেছেন, তখনই তার মনের সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠল এবং তার মনে হলো যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মওসুম ছাড়াই যদি ফল দিতে পারেন, তবে বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। তাঁর দু'আ সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيۡعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾

"সেখানেই যাকারিয়্যা তার রবের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"(সূরা আলে-ইমরান:৩৮)

তাঁর দু'আ টি সূরা মারিয়ামে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ وَہَنَ الۡعَظۡمُ مِنِّیۡ وَ اشۡتَعَلَ الرَّاۡسُ شَیۡبًا وَّ لَمۡ اَکُنۡۢ بِدُعَآئِکَ رَبِّ شَقِیًّا ﴿۴﴾ وَ اِنِّیۡ خِفۡتُ الۡمَوَالِیَ مِنۡ وَّرَآءِیۡ وَ کَانَتِ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرًا فَہَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا ۙ﴿۵﴾یَّرِثُنِیۡ وَ یَرِثُ مِنۡ اٰلِ یَعۡقُوۡبَ ٭ۖ وَ اجۡعَلۡہُ رَبِّ رَضِیًّا ﴿۶﴾

"তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। আর আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। কাজেই আপনি আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী,যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার রব! তাকে করবেন সন্তোষভাজন।"(সূরা মারইয়াম:৪-৬)

আলেমদের মতে, এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ নবুওয়াত-রিসালত তথা ইলমের উত্তরাধিকার। বৈষয়িক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। প্রথমত,ঐতিহাসিকগণের মতে হযরত যাকারিয়া আ: পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। স্বহস্তে উপার্জিত রোজগার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, যেমনটি করতেন হযরত দাউদ আ.। বলাবাহুল্য, নবীগণ সাধারণত আয়-রোজগারে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করতেন না, যার দ্বারা অতিরিক্ত মাল সঞ্চয় হতে পারে এবং পরবর্তী সন্তানগণ তার উত্তরাধিকারী হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত এক হাদীসে বলা হয়েছে: "নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।"- [আবু দাউদ: ৩৬৪১, ইবনে মাজহ: ২২৩, তিরমিযী: ২৬৮২]

এতে এও বুঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্য দু'আ করা রাসূলগণের ও নেককারদের সুন্নাত। তাঁর উক্ত দু'আ কবুল করে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হন কেননা ততদিনে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। আর তাঁর স্ত্রীও ছিল বন্ধ্যা।

فَنَادَتۡہُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَ ہُوَ قَآئِمٌ یُّصَلِّیۡ فِی الۡمِحۡرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰہَ یُبَشِّرُکَ بِیَحۡیٰی مُصَدِّقًۢا بِکَلِمَۃٍ مِّنَ اللّٰہِ وَ سَیِّدًا وَّ حَصُوۡرًا وَّ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۳۹) قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَکُوۡنُ لِیۡ غُلٰمٌ وَّ قَدۡ بَلَغَنِیَ الۡکِبَرُ وَ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرٌ ؕ قَالَ کَذٰلِکَ اللّٰہُ یَفۡعَلُ مَا یَشَآءُ ﴿۴۰﴾ قَالَ رَبِّ اجۡعَلۡ لِّیۡۤ اٰیَۃً ؕ قَالَ اٰیَتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَۃَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمۡزًا ؕ وَ اذۡکُرۡ رَّبَّکَ کَثِیۡرًا وَّ سَبِّحۡ بِالۡعَشِیِّ وَ الۡاِبۡکَارِ ﴿۴۱﴾

“অতঃপর যখন যাকারিয়া ইবাদত কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফেরেশতারা তাকে আহবান করে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকৃত এক কালেমাকে সত্যায়নকারী,নেতা, ভোগ, আসক্তিমুক্ত এবং পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী।” তিনি বললেন, “হে আমার রব! আমার। পুত্র হবে কিভাবে? অথচ আমার বার্ধক্য এসে গিয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘এভাবেই’। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। তিনি বললেন, হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন । যা দ্বারা আমি বুঝতে পারবো যে গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার নিদর্শন এই যে, তিন দিন আপনি ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলবেন না আর আপনার রবকে অধিক স্মরণ করুন এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন।(সূরা আলে ইমরান:৩৯-৪১)

সূরা মারইয়ামে “তিনদিন” এর স্থলে “তিনরাত” শব্দটি এসেছে । অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত তিনি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে কথা বলতে পারতেন না । শুধু জিকির-আযকার, তাসবীহ ও তেলাওয়াত করতে পারতেন । সুতরাং তাঁকে সন্তান জন্মের এমনই আলামত দেওয়া হল, যা ছিল আল্লাহর ইবাদত ও শোকর ।

যাকারিয়া আ: এর প্রার্থনা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَّرَهَباً وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِينَ- (٨٩-٨٠)

“এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ কর, যখন সে তার প্রভুকে আহবান করেছিল, হে আমার পালনকর্তা! তুমি ‘আমাকে (উত্তরাধিকারীহীন) একা ছেড়ো না! তুমি তো (ইলম ও নবুয়তের) সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী’। ‘অতঃপর আমরা তার দো‘আ কবুল করেছিলাম। তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম যোগ্যতাসম্পন্ন। তারা সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত।” (সূরা আম্বিয়া ২১:৮৯-৯০)

✎ যাকারিয়া আ: এর মর্যাদা...

হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) ইসলামের একজন মহান নবী, যিনি বনী ইসরাইলের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি কুরআন ও হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখিত নবীদের একজন এবং তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো মুসলিমদের জন্য ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ন্যায়পরায়ণতার অনন্য উদাহরণ।

তিনি ছিলেন ধৈর্য ও বিশ্বাসের এক মূর্ত প্রতীক । তিনি বহু বছর সন্তান না পেয়ে আল্লাহর কাছে ধৈর্যের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পরও তিনি আল্লাহর রহমতের প্রতি আস্থা হারাননি। তাঁর দুআর ফলে আল্লাহ তাকে পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া আ: কে দান করেন, যিনি নিজেও নবী ছিলেন। ইয়াহইয়া আ-কে পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং মানুষের জন্য উদাহরণ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। এটি আল্লাহর অসীম শক্তি ও করুণার প্রমাণ। হযরত যাকারিয়া আ: ইবাদতে অত্যন্ত একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন এবং মসজিদে ইবাদত করতেন। তার জীবন আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করার শিক্ষা দেয়।

মোটকথা, তাঁর জীবন আমাদের জন্য ধৈর্য, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা এবং প্রার্থনার শিক্ষা দেয়। তিনি ছিলেন একান্ত বিনীত, ইবাদতে মনোযোগী এবং সমাজে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য নিষ্ঠাবান। তার জীবনের ঘটনা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং দয়ালু প্রকৃতির স্মারক।

হযরত ইয়াহইয়া আ:

✍ ইয়াহইয়া আ: এর পরিচয়...

হযরত ইয়াহইয়া আ: ছিলেন হযরত যাকারিয়া আ:-এর পুত্র এবং তাঁর পয়গম্বরি দুআর সুফল। তিনি ছিলেন যাকারিয়া আ: পরবর্তী বনি ইসরাইলের নবী এবং বাইতুল মুকাদ্দাস এর অধিবাসী । তিনি মারিয়াম আ:-এর খালাতো ভাই ছিলেন । তাঁর নাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত। এটি এমন এক নাম যা তাঁর বংশে ও খান্দানে ইতঃপূর্বে আর কারো রাখা হয় নি। যেমন-কুরআন মাজিদ এ বলা হয়েছে:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

“হে যাকারিয়া! আমরা আপনাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া; এ নামে আগে আমরা কারো নামকরণ করিনি।”(সূরা মারইয়াম:৭)

✍ ইয়াহইয়া আ: এর জন্ম...

যাকারিয়া আ: এর দু’আর বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইয়াহইয়া আ: জন্মের সুসংবাদ দান করেন । শেষ বয়সে এসে পুত্র সন্তান লাভের সংবাদটি ছিল তাঁর জন্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর । আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যখন তাঁকে এই সুখবর দেওয়া হয় সেই সময়ের ঘটনা সূরা মারিয়ামে এভাবে উল্লেখ রয়েছে,

قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَکُوۡنُ لِیۡ غُلٰمٌ وَّ کَانَتِ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرًا وَّ قَدۡ بَلَغۡتُ مِنَ الۡکِبَرِ عِتِیًّا ﴿۸﴾ قَالَ کَذٰلِکَ ۚ قَالَ رَبُّکَ ہُوَ عَلَیَّ ہَیِّنٌ وَّ قَدۡ خَلَقۡتُکَ مِنۡ قَبۡلُ وَ لَمۡ تَکُ شَیۡئًا ﴿۹﴾ قَالَ رَبِّ اجۡعَلۡ لِّیۡۤ اٰیَۃً ؕ قَالَ اٰیَتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِیًّا ﴿۱۰﴾ فَخَرَجَ عَلٰی قَوۡمِہٖ مِنَ الۡمِحۡرَابِ فَاَوۡحٰۤی اِلَیۡہِمۡ اَنۡ سَبِّحُوۡا بُکۡرَۃً وَّ عَشِیًّا ﴿۱۱﴾

“তিনি বললেন, হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত! তিনি বললেন, এরূপই হবে। আপনার রব বললেন, এটা আমার জন্য সহজ; আমি তো আগে আপনাকে সৃষ্টি করেছি। যখন আপনি কিছুই ছিলেন না। যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, আপনার নিদর্শন এ যে, আপনি সুস্থ থাকা সত্বেও কারো সাথে তিন দিন কথাবার্তা বলবেন না।তারপর তিনি (ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট) কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন এবং

ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন।"(সূরা মারইয়াম:৮-১১)

✍ ইয়াহইয়া আ: এর গুণাবলি...

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইয়াহইয়া আ:-এর অনেক প্রশংসা করেছেন । তার সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا- وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا- وَبَرّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا- وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا-(١٥-١٢)

"হে ইয়াহইয়া! আপনি কিতাবটিকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন। আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম প্রজ্ঞা। এবং নিজ পক্ষ থেকে দান করেছিলাম হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; আর তিনি ছিলেন মুত্তাকী। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার অনুগত এবং উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না । তার উপরে শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মারইয়াম :১২-১৫)

ছোট বেলা থেকেই তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুঝ, দৃঢ়তা, স্থিরতা, কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামিতা এবং অসৎকাজ থেকে বিমুখতা এ সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক বলেন, মা'মার বলেনঃ ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া কে কিছু ছোট ছেলে-পুলে বলল যে, চল আমরা খেলতে যাই। তিনি জবাবে বললেনঃ খেল-তামাশা করার জন্য তো আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। (ইবনে কাসীর)

যখন তিনি জ্ঞানলাভের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছেন তখন তাঁকে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয় ও তাঁর উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে তিনি তাওরাতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবেন এবং বনী ইসরাইলকে এ পথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তাঁর অন্তরে মায়া-মমতা ঢেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহও তাঁকে ভালবাসতেন। তিনিও আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালবাসতেন। একজন মায়ের মনে নিজের সন্তানের জন্য যে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহশীলতা থাকে, যার ভিত্তিতে সে শিশুর কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ে, আল্লাহর বান্দাদের জন্য ইয়াহইয়ার মনে এই ধরনের স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়েছিল। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] তিনি আল্লাহর অবাধ্যতা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা হতে মুক্ত ছিলেন।

হযরত ঈসা আ:

ঈসা আ:-এর পরিচয়...

হযরত ঈসা আ: ছিলেন বনি ইসরাইল বংশে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল । আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর আসমানী কিতাব "ইনজিল" নাযিল করেন । তাঁর পর থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা: এর আগমন পর্যন্ত মাঝে আর কোন নবী কিংবা রাসুল প্রেরিত হননি । এই সময়টাকে فترة الرسل বা 'রাসূল আগমনের বিরতিকাল' বলা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ঈসা আ: সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ।

ঈসা আ:-এর মাতা হযরত মারইয়াম...

ঈসা আ:-এর মা হযরত মারইয়াম ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান ও পুণ্যবতী একজন নারী । যার নামে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একটি সম্পূর্ণ সূরা নাযিল করেন । এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে এভাবে দিয়েছেন,

وَ اِذۡ قَالَتِ الۡمَلٰٓئِکَۃُ یٰمَرۡیَمُ اِنَّ اللّٰہَ اصۡطَفٰکِ وَ طَہَّرَکِ وَ اصۡطَفٰکِ عَلٰی نِسَآءِ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۴۲﴾
یٰمَرۡیَمُ اقۡنُتِیۡ لِرَبِّکِ وَ اسۡجُدِیۡ وَ ارۡکَعِیۡ مَعَ الرّٰکِعِیۡنَ ﴿۴۳﴾

"যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, "হে মারিয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন । হে মারিয়াম! তুমি নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল থাকো এবং সেজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর ।"(সূরা আলে ইমরান:৪২-৪৩)

মারইয়াম ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমাম হযরত ইমরানের কন্যা । মারইয়াম এর জন্মের পূর্বে তাঁর আর কোন সন্তান ছিল না । তাই তাঁর স্ত্রী হান্না মানত করেছিলেন, তাঁর পুত্র সন্তান হলে তাকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করবেন । অতঃপর যখন তাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন তিনি আক্ষেপ করে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি যে কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম!" আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, সে কি পুণ্যবতী সন্তান জন্ম দিয়েছে তা সে জানে না । তা আল্লাহই জানেন। সে এক অসাধারণ ভাগ্যবতী ও মহিমাময়ী নারী এবং

সেই সঙ্গে তাঁর সত্তায় নিহিত আছে এক মহান নবীর অস্তিত্ব। যার জন্ম হবে কুদরতের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন ।

অতঃপর মারইয়ামকে বাইতুল মুকাদ্দাস এর খেদমতে নিয়োজিত করা হলো । তিনি মসজিদ সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন । তাঁর খালু হযরত যাকারিয়া আ: তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন । আল্লাহ তায়ালার কুদরতে তাঁর নিকট অসময়ের ফল ও খাদ্য সামগ্রী আসতো । তাঁর খালু ছিলেন নিঃসন্তান । যখন দেখলেন যে, যে আল্লাহর অপার মহিমায় মারইয়াম এসব ফল ও খাদ্য সামগ্রী পেয়ে থাকে তখন তাঁর খেয়াল হলো যে, সে আল্লাহই তাকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তানও দান করতে পারেন । তাই তিনি সন্তান লাভের দুআ করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইয়াহইয়া আ: জন্মের সুসংবাদ দেন। যিনি ঈসা আ:-এর পূর্বেই নবুওয়াত লাভ করেন ।

✐ ঈসা আ:-এর জন্ম...

মেহরাবে অবস্থান করে মারইয়াম যখন বাইতুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন এমন সময় একদিন জিব্রাইল আ: মানবাকৃতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন । এবং তাঁকে ঈসা আ: জন্মের সুসংবাদ দিলেন । ঈসা আ:-এর জন্ম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا-(١٦-٢١)

“(হে মুহাম্মাদ!) আপনি এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল । অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের ‘রূহ’ (অর্থাৎ জিব্রীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল । মারইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব । মারইয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই । সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে)

মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন ও আমাদের পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়।"(সূরা মারইয়াম:১৬-২১)

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا- فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا- فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا-

"অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তখন সে তাকে নিয়ে একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম । এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে) আওয়াজ দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন। আর তুমি খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহর জন্য সিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না।"(সূরা মারিয়াম:২২-২৬)

উল্লেখ্য যে, বিগত বিভিন্ন শরী'আতে সম্ভবতঃ সিয়াম পালনের সাথে অন্যতম নিয়ম ছিল সারাদিন মৌনতা অবলম্বন করা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারইয়াম যখন শিশুটিকে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে এলেন সে বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা এরূপ,

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا- وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا-(٢٧-٣٣)

"অতঃপর মারইয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না। অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব? শিশুটি (ঈসা) তখন বলে উঠল, আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। এবং আমার মায়ের অনুগত বানিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব।" (সূরা মারিয়াম ১৯:২৭-৩৩)

হযরত মারইয়াম এর গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ঈসা আ: ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং নবজাতক হওয়া সত্ত্বেও কথা বলতে পারা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনাটি ছিল অলৌকিক । কেননা, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছেন ঈসা আ: এর জন্মপ্রক্রিয়া ছিল তার ব্যতিক্রম । স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের এক নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন । এ বিষয়টি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ-(٦٠-٥٩)

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হল আদমের মত। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল। যা তোমার প্রভু আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৫৯-৬০)

অর্থাৎ আদম আ:-কে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা আ:-কেও তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

✍ হযরত মারইয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য...

সমাজের লোকেরা মারইয়াম আ:-এর প্রতি যে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিল তা খন্ডন করার জন্য আল্লাহ তাআলা সূরা তাহরীমে উল্লেখ করেছেন,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ-(١٢)

“তিনি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল এবং সে ছিল বিনয়ীদের অন্যতম।” (সূরা তাহরীম:১২)

✍ ঈসা আ: এর মু’জিযাসমূহ...

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণই ছিল এক বিশেষ মু’জিযা । কেননা স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেন । স্বয়ং আল্লাহ যার নাম রাখেন মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। তাঁকে বলা হয় “আল্লাহর কালিমা” । তাঁর জন্মের পর যখন তিনি ছিলেন দুধের শিশু তখন আল্লাহ তায়ালা মারইয়াম আ: এর পবিত্রতা স্পষ্ট করার জন্য অলৌকিকভাবে তাঁকে কথা বলার শক্তি দান করেছিলেন । তাঁর বেশকিছু মু’জিযা সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ রয়েছে,

وَ رَسُوۡلًا اِلٰی بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ۬ۙ اَنِّیۡ قَدۡ جِئۡتُکُمۡ بِاٰیَۃٍ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ ۙ اَنِّیۡۤ اَخۡلُقُ لَکُمۡ مِّنَ الطِّیۡنِ کَہَیۡـَٔۃِ الطَّیۡرِ فَاَنۡفُخُ فِیۡہِ فَیَکُوۡنُ طَیۡرًۢا بِاِذۡنِ اللّٰہِ ۚ وَ اُبۡرِئُ الۡاَکۡمَہَ وَ الۡاَبۡرَصَ وَ اُحۡیِ الۡمَوۡتٰی بِاِذۡنِ اللّٰہِ ۚ وَ اُنَبِّئُکُمۡ بِمَا تَاۡکُلُوۡنَ وَ مَا تَدَّخِرُوۡنَ ۙ فِیۡ بُیُوۡتِکُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿ۚ۴۹﴾

“আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে (প্রেরণ করবেন, তিনি বলবেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব, তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব, ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও

এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হও।”(সূরা আলে ইমরান: ৪৯)

এগুলো সবই ছিল মু’জিযা, যা আল্লাহ তাআলা ঈসা আ:-কে নবুয়তের নিদর্শন স্বরূপ দান করেছিলেন এবং তিনি এগুলো করে দেখিয়েছিলেন । সূরা মায়েদার ১১০ নম্বর আয়াতেও তাঁর এই সকল মু’জিযার কথা উল্লেখ রয়েছে । তাঁর অন্যতম বড় মু’জিযা হলো- আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর আসমানী কিতাব ইঞ্জিল নাজিল করেন । তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قَفَّیۡنَا عَلٰۤی اٰثَارِہِمۡ بِعِیۡسَی ابۡنِ مَرۡیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡہِ مِنَ التَّوۡرٰىۃِ ۪ وَ اٰتَیۡنٰہُ الۡاِنۡجِیۡلَ فِیۡہِ
ہُدًی وَّ نُوۡرٌ ۙ وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡہِ مِنَ التَّوۡرٰىۃِ وَ ہُدًی وَّ مَوۡعِظَۃً لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۴۶﴾

“আর আমি তাদের (নবীগণের) পশ্চাতে মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম, তার সামনে তাওরাত থেকে যা বিদ্যমান রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর আমরা তাকে ইঞ্জীল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো; আর তা ছিল তার সামনে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ।”(সূরা মায়িদা: ৪৬)

ইহুদীরা ঈসা আ:-কে শূলে চড়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিল । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন এবং নিজ কুদরতে ঈসা আ:-কে আসমানে তুলে নেন এবং তাঁকে যারা ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তাঁর সদৃশ বানিয়ে দেন । এতে শত্রুরা ঈসা আ: মনে করে তাকে শূলে চড়ায়।

✍ ঈসা আ:-এর দাওয়াত...

হযরত ঈসা আ:-কে বনী ইসরাইল জাতির নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল । তিনি যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন তখন নিজ কওমকে এক আল্লাহর দিকে সত্যের পথে ডাকতে থাকেন । তিনি তাদের বলেছেন, “আমার পূর্বে যে কিতাব এসেছে অর্থাৎ তাওরাত, আমি তার সমর্থনকারী এবং আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে যাতে তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করি এবং আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার কথা মানো ।”(সূরা আলে ইমরান: ৫০) মূসা আ:-এর শরীয়তে বনি ইসরাঈলের সীমালঙ্ঘনের

কারণে তাদের প্রতি কিছু জিনিস হারাম করা হয়েছিল হযরতে ঈসা আ:-এর শরীয়তে সেগুলোকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে । যেমন-

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وإِنَّا لَصَادِقُوْنَ-(١٤٦)

“এবং ইহুদীদের জন্য প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী”। (সূরা আন‘আম:১৪৬)

হযরত ঈসা আ: বনী ইসরাইলকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা: আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন । এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ ...﴿٦﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং সেই রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে “আহমাদ” ।(সূরা সাফ-৬) উল্লেখ্য,“আহমাদ” মহানবী সা: এরই আরেক নাম ।

তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি বনী ইসরাইলকে তাঁর আনীত নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন। যেমন-মাটি দ্বারা পাখি তৈরি করে তাতে জীবনসঞ্চার করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তোলা এবং মৃতকে জীবিত করা । যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য বা চর্চা থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তি সহ নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন- মূসা আ:-এর সময় মিসরে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব। ফলে আল্লাহ তাঁকে লাঠির মু‘জিযা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে ঈসা আ:-এর সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সেকারণ ঈসা আ: কে আল্লাহ অলৌকিক ক্ষমতা ও মু‘জিযা সমূহ দিয়ে পাঠান।

✍ ঈসা আ: এর হাওয়ারীগণ...

ঈসা আ: এর দাওয়াতে কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলেই তাদের কুফরির উপর অটল রইল । তিনি যখন বুঝে ফেললেন যে, বনী ইসরাইল তাঁর দ্বীন কবুল না করে কুফরিতে অটল থাকবে এবং তাঁর সাথে শত্রুতাই করে যাবে তখন তিনি তার অনুসারীদের বললেন, "কে কে আছে যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ বলল, আমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত । হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা কিছু নাযিল করেছেন, আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সেই সকল লোকের মধ্যে লিখে নিন যারা সত্যের সাক্ষ্যদাতা ।"(সূরা আলে ইমরান:৫২-৫৩)

(ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী বা সহচরদের হাওয়ারি বলা হয়। যেমন-রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে সাহাবী বলা হয় ।)

অন্যত্র এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوْا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ-(١٤)

"হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছে আল্লাহর জন্য আমাকে সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একটি দল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের উপরে। ফলে তারা বিজয়ী হল।" (সূরা সাফ:১৪)

মুসা আ: এর অনুসারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে জান্নাতি খাবার "মান্না ও সালওয়া" প্রেরণ করেছিলেন । সম্ভবত তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দিন একদিন হাওয়ারিগণ ঈসা আ: এর কাছে অনুরূপ দাবি করল। তারা বলল, "হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কে আমাদের জন্য আসমান থেকে একটা খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে সক্ষম?" ঈসা আ: বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও ।" অর্থাৎ একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর কাছে কোন রকম মু'জিযা ফরমায়েশ করা কিছুতেই সমীচীন নয় । কেননা এই ধরনের দাবি তো কাফিররাই করত । তারা বলল, "আমরা চাই যে, তা থেকে খাবো এবং আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে এবং আমরা আগে থেকে অধিক প্রত্যয় এর সাথে জানতে পারব

যে, আপনি আমাদেরকে যা কিছু বলেছেন তা সত্য আর আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব ।"

তারপর ঈসা আ: আল্লাহর কাছে দুআ করে বললেন, "হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যা হবে আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ উদযাপনের কারণ এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন। আমাদেরকে এই নিয়ামত অবশ্যই প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।" জবাবে আল্লাহ তাঁকে বললেন, "আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি সে খাঞ্চা অবতীর্ণ করব কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে কেউ কুফরি করবে আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অন্য কাউকে দেবো না ।"

আসমান থেকে সে রকম খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কিছু বলা হয়নি । তবে তিরমিজি শরীফে আম্মার ইবনে ইয়াসার রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং তা ছিল রুটি ও গোস্ত এবং তাদের আদেশ করা হয়েছিল কেউ যেন তা থেকে আগামী কালের জন্য সঞ্চয় করে না রাখে ও খেয়ানত না করে । কিন্তু তারা সে আদেশ অমান্য করে । ফলে তাদের বানর ও শুকর বানিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তাদেরকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।**(১)**

✍ ঈসা আ:-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর আসমানে ঊর্ধারোহন...

ষড়যন্ত্রকারী ইহুদিরা ঈসা আ:-কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল । তাই তারা তাঁকে ধরার জন্য তার বাড়ি ঘেরাও করে । তখন ঈসা আ: স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এই ঘর থেকে বের হতে ও নিহত হতে এবং আখেরাতে জান্নাতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঈসা আ: নিজের জামা ও পাগড়ী তাকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাকে ঈসা আ:-এর সাদৃশ করে দেয়া হলো। যখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, তখন ইহুদিরা ঈসা আ: মনে করে তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শুলে চড়িয়ে হত্যা করলো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ঈসা আ:-কে হত্যা করার জন্য ইহুদিরা জনৈক নরাধম কে ভেতরে পাঠায়। যে ব্যক্তি তাকে খোঁজার জন্য ভিতরে প্রবেশ করেছিল আল্লাহ তা'আলা তাকেই ঈসা আ:-এর আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন এবং ঈসা আ:-কে আসমানে তুলে নেন । যখন সে ব্যক্তিটি ঈসা আ:-কে না পেয়ে বাইরে বের হয়ে এলো তখন ইহুদিরা তাকে ঈসা আ: মনে করে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো । তারপর তারা বলাবলি করতে লাগলো যে নিহত লোকটি যদি ঈসা হয় তবে আমাদের লোক কই গেল, আর যদি আমাদের সেই লোক হয় তবে ঈসা কোথায় গেল? এভাবে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল । কেউ বলল, সেই ঈসা আবার কেউ বলল, ঈসা নয় বরং অন্য লোক । তারা নিজেরাই সন্দেহে নিপতিত হলেও বলে বেড়াতে লাগলো যে তারা ঈসা-কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছে । এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَّ قَوۡلِہِمۡ اِنَّا قَتَلۡنَا الۡمَسِیۡحَ عِیۡسَی ابۡنَ مَرۡیَمَ رَسُوۡلَ اللّٰہِ ۚ وَ مَا قَتَلُوۡہُ وَ مَا صَلَبُوۡہُ وَ لٰکِنۡ شُبِّہَ لَہُمۡ ؕ وَ اِنَّ الَّذِیۡنَ اخۡتَلَفُوۡا فِیۡہِ لَفِیۡ شَکٍّ مِّنۡہُ ؕ مَا لَہُمۡ بِہٖ مِنۡ عِلۡمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوۡہُ یَقِیۡنًۢا ﴿۱۵۷﴾ۙ بَلۡ رَّفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیۡہِ ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ عَزِیۡزًا حَکِیۡمًا ﴿۱۵۸﴾

"আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় 'ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তার "সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।"(সূরা নিসা: ১৫৭-১৫৮)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তারা যে ঈসা আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

✍ নাসারা বা খ্রিস্টানদের বিশ্বাস খন্ডন...

একদিকে ইহুদিরা ঈসা আ:- কে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ি পথ অবলম্বন করেছে। তারা ঈসা আ:-কে আল্লাহর নবী হিসেবে স্বীকার করেনি। বরং তাঁর মাতা মারইয়াম আ:-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তার নিন্দাবাদ করেছে। অপরদিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা সাধারণত ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী । ত্রিত্ববাদ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তিন সত্তা অর্থাৎ পিতা, পুত্র (মাসীহ) ও পবিত্র আত্মা (রুহুল কুদস) এর সমষ্টির নাম । তাদের একদলের মতে তৃতীয়জন হলেন মারিয়াম আ:। তারা ঈসা আঃ কে আল্লাহতায়ালার পুত্র বলতে শুরু করে এবং এই আকিদা পোষণ করতে থাকে যে, আল্লাহ তিনজন পিতা, পুত্র এবং পাক রূহ (নাউজুবিল্লাহ) । কেউ কেউ বলে, মাসীহ আ: শুধু ঈশ্বর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না । আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিশ্বাস কে খন্ডন করে পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় উল্লেখ করেন,

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ۫ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾

"হে কিতাবীগণ! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। মারইয়াম-তনয় ঈসা মাসীহ কেবল আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার কালিমা, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তার পক্ষ থেকে রূহ। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলদের উপর ঈমান আন এবং বলো না, তিন! নিবৃত্ত হও, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহই তো এক ইলাহ; তার সন্তান হবে---তিনি এটা থেকে পবিত্র-মহান। আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই; আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট। মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না। আর কেউ তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন"(সূরা নিসা:১৭১-১৭২)

সূরা মায়িদা তে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّىْ وَ رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۷۲﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾

“যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ তিনি তো মারইয়াম-তনয় মাসীহ, অবশ্যই তারা কুফরী করেছে। অথচ মাসীহ বলেছিলেন, হে ইসরাঈল-সন্তানগণ! আল্লাহর ইবাদাত কর,যিনি আমার রব ও তোমাদের রব। নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তারা অবশ্যই কুফরী করেছে- যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে তৃতীয়, অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর তারা যা বলে তা থেকে বিরত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর অবশ্যই কষ্টদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।”(সূরা মায়িদা:৭২-৭৩)

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۷۵﴾

“মারইয়াম-তনয় মসীহ শুধু একজন রাসূল। তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন
এবং তার মা অত্যন্ত সত্য নিষ্ঠা ছিলেন। তারা দুজনেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। দেখুন, আমরা তাদের জন্য আয়াতগুলোকে কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; তারপরও দেখুন, তারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!”(সূরা মায়িদা:৭৫)

অর্থাৎ অন্যান্য নবী যেমন দুনিয়াতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে চলে গেছেন; কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতই একজন মানুষ। একজন রাসূলের বেশী তো তিনি কিছু নন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার মা মারইয়াম আ: উভয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, তাঁরা উভয়েই ছিল অন্যান্য মানুষের মতোই পানাহারের মুখাপেক্ষী । অথচ আল্লাহ তো সকল কিছু হতে অমুখাপেক্ষী । আর যে পানাহার থেকে মুক্ত নয়, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগতের মুখাপেক্ষী, সে কিভাবে আল্লাহ হতে

পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী।

✍ পুনরায় ঈসা আ:- এর দুনিয়ায় আগমন প্রসঙ্গে...

বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আ: পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। হযরত নওয়াস ইবনে সামআন রা: হতে বর্ণিত একটি হাদীসে পাওয়া যায়, কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল আগমনের পর সে যখন পুরো দুনিয়ায় ফিতনার বিস্তার ঘটাবে তখন আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আ:-কে [আকাশ হতে প্রেরণ করবেন এবং তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের শ্বেত মিনারা হতে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম ঝরবে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় ঝরতে থাকবে। যে কোনো কাফের তার শ্বাসের বায়ু পাবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। অথচ তাঁর শ্বাসবায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌছে যাবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে (বায়তুল মুকাদ্দাসের 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন।অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায় হযরত ঈসা আ:-এর নিকট আসবে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদে রেখেছিলেন। তখন তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য কি পরিমান বুলন্দ মর্তবা রয়েছে সেই সুসংবাদ প্রদান করবেন। এদিকে তিনি এ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আ:-এর নিকট এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছু সংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। অতএব তুমি আমার বান্দাদেরকে 'তুর' পর্বতে নিয়ে হেফাজত একত্রিত কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচু জায়গা হতে নিচে জনে নেমে তে বিচরণ করতে থাকবে এবং তাদের প্রথম দল তাবারিয়া'নদী [সিরিয়ার একটি নদী। অতিক্রম করবে এবং তারা এটার সবটুকু পানি পান করে ফেলবে। ফলে তাদের সর্বশেষ দল সেস্থান অতিক্রম করবার সময় বলবে, হয়তো কোনো একসময় এখানে পানি ছিল। অতঃপর তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খামার' নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌছবে। এটা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত পাহাড়। এখানে পৌঁছে তারা বলবে, জমিনে যারা বসবাস করত ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিত সবাইকে হত্যা করে ফেলেছি। এবার আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করে ফেলি। এই বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।আর আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরগুলোকে রক্তমাখ অবস্থায় তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেবেন। এ সময় আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ: ও তাঁর সঙ্গীগণকে তুর পর্বতে চরম

দুরবস্থায় অবরোধ করা হবে। অর্থাৎ তাঁরা ভীষণ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবেন। এমনকি তাঁদের কারে জন্য একটি গরুর মাথা এ যুগের একশত দিনার অবস্থায় আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ: এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে রুজু হবেন। [এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের ধ্বংসের জন্য ফরিয়াদি দোয়া করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের গর্দানের উপর বিষাক্ত কীটের আল জিবন এটা উট, বকরির নাকের মধ্যে আজাব করবেন। যাবে। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ: ও তাঁর ইয়াজুজ ও মাজুজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হতে মুক্ত, এমন একবিঘত জমিনও খালি পাবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত ঈসা আ: ও তাঁর সঙ্গীগণ [উক্ত মসিবত হবে নাজাত পাওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বখ্তী উটের গর্দানের ন্যায় লম্বা লম্বা গর্দানবিশিষ্ট পাখির ঝাঁক প্রেরণ করবেন। পাখির দল তাদের মরদেহসমূহকে তুলে নেবে এবং যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে নিয়ে নিক্ষেপ করবে।**(২)**

✍ ঈসা আ:-এর দেহাবয়ব...

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বললেন, আমি অদ্যরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি কা'বা শরীফের নিকটে উপস্থিত। সেখানে আমি গৌরবর্ণের এক লোককে দেখতে পেলাম। যিনি তোমার দেখা গৌরবর্ণের সর্বাপেক্ষা সুন্দর লোকদের অন্যতম। তার লম্বা চুল ছিল, যা তোমার দেখা সর্বাপেক্ষা সুন্দর বাবরি চুলের অন্যতম ছিল। যেগুলোকে সে আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রেখেছিল উক্ত চুল হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই লোকটি কে? উত্তরে [ফেরেশতাগণ! বললেন, ইনি মাসীহ ইবনে মারইয়াম।(৩)

✍ ঈসা আ: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

ঈসা আ: আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন একজন নবী ও রাসূল। তিনি আল্লাহর এক বিশিষ্ট প্রেরিত ব্যক্তি, যাঁকে মানবজাতির কাছে দ্বীন ও হিদায়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। ঈসা আ:-কে আল্লাহ একটি অলৌকিক উপায়ে তাঁর মা মারইয়ামের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন, পিতৃহীন অবস্থায়। তাঁকে আল্লাহ "রূহুল্লাহ" (আল্লাহর রূহ) এবং "কালিমাতুল্লাহ" (আল্লাহর বাক্য) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর অলৌকিক জন্ম এবং জীবনের কারণে তিনি মানবজাতির কাছে এক বিশেষ স্থান দখল করেন।

তিনি আল্লাহর হুকুমে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেছেন। তিনি সর্বদা তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহর পথে থেকে মানুষের শত্রুতা সত্ত্বেও দ্বীন প্রচার অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর মা মারইয়াম আ:-এর মতোই ঈসা আ: পবিত্র ও আত্মসংযমী জীবনযাপন করেছেন। এটি আমাদের পাপ থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্ব শেখায়।

ঈসা আ: একজন মহান নবী, যাঁর জীবন ও বার্তা সকলের জন্য এক অমূল্য শিক্ষার উৎস। তাঁর জীবনী থেকে তাওহিদের প্রতি দৃঢ়তা, ধৈর্য, সত্যবাদিতা, এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতির শিক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহর আদেশ পালনে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও সততার পথে থাকার শিক্ষা গ্রহণই তাঁর জীবনের মূল বার্তা।

☞ রেফারেন্স:

১.আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩০৬১, ‘তাফসীর’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫০ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘ন্যায় কাজের আদেশ’ অনুচ্ছেদ-২২।
২.মিশকাতুল মাসাবীহ, পরিচ্ছেদ: ’কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ ও দাজ্জালের বর্ণনা’ হাদিস নং ৫২৪১
৩. মিশকাতুল মাসাবীহ্ পরিচ্ছেদ: ’কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ ও দাজ্জালের বর্ণনা’ হাদিস নং ৫২৪৯

হযরত মুহাম্মাদ সা:

✍ পরিচয়...

বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সা:-কে আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন আনুমানিক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে । ইতিহাসবিদগণ আরব সম্প্রদায়সমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছেন, ১. আল-আরব আল বায়িদাহ, ২. আল-আরব আল বা'কিয়াহ । এ দ্বিতীয় শ্রেণীকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন-১. আরবে আরিবা বা কাহ্তানি আরব, ২. আরবে মুস্তা'রিবা বা আদনানী আরব । আদনানী আরব হচ্ছে ওই সম্প্রদায় যারা ইসমাঈল আ:-এর বংশোদ্ভুত। আদনান ছিলেন ইসমাঈল আ:-এর বংশধর । যার বংশধরদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ সা: প্রেরিত হয়েছিলেন । রাসূল সা: বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম আ:-এর সন্তানাদির মধ্য থেকে ইসমাঈল আ:-কে, ইসমাঈল আ:-এর সন্তানাদির মধ্যে থেকে কিনানাকে মনোনীত করেন। কিনানার বংশধরদের মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।"**(১)** আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম । যার প্রতিটি বিধি-বিধান অনুসরণের মাধ্যমে রাসুল সা: এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সমানভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) [الأحزاب: ٢١]

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"(সূরা আল-আহযাব: ২১)

তিনি বলতেন, أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ، وَبُشْرَى عِيْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ 'আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো'আ ও ঈসার সুসংবাদ'।**(২)** কেননা ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় দো'আ করেছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (بقرة-১২৯)

‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তাদের মধ্য হ’তে একজনকে তাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) শিক্ষা দিবেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন’ (বাক্বারাহ ২/১২৯)।

তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত আল্লাহ তা’আলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল । তাঁর আগমনের পর মহান আল্লাহ নবুয়তের ধারাকে রহিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর পরে কোন নবী বা রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। এজন্য তাঁকে ‘খতামুন নাবিয়্যিন’ বলা হয়।

✍ তৎকালীন আরবের ধর্মীয়,সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা...

প্রাচীন জাহেলী যুগে সমাজের মানুষ আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করত। তারা আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু একই সাথে তারা মনে করত যে আল্লাহ তা'আলা অতি পবিত্র সত্তা তাই সরাসরি তাঁর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয় তাই তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে কিছু মনগড়া উপাস্য নিজেদের জন্য স্থির করে নিয়েছিল । তারা নিজেদেরকে ইব্রাহিম আ: প্রবর্তিত সত্য ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করত তবে প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ইব্রাহিম আ:-এর ধর্ম হতে পুরোপুরি বিচ্যুত। তারা ভয়ানক মূর্তি পূজা ও শিরকে লিপ্ত ছিল। তৎকালীন আরবে শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটে আমর বিন লুহাই এর মাধ্যমে । আমর বিন লুহাই ছিল বনু খুযায়া গোত্রের নেতা । ঐতিহাসিকদের মতে, সে একবার শামে ভ্রমন করতে গিয়েছিল । সেখানে আমালিক নামে এক পৌত্তলিক বা মূর্তিপূজক সম্প্রদায় বাস করত । সে তাদের পার্থিব ধন-সম্পদ এবং সাফল্য দেখে অবাক হয়ে যায় এবং তাদেরকে এ সফলতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা তাকে জানায় তাদের সমস্ত সফলতার কারণ তাদের দেবতা । তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল হুবাল । অতঃপর আমার বিন লুহাই তাদের কাছ থেকে হুবাল দেবতার একটি মূর্তি এনে মক্কায় পবিত্র কা’বা ঘরে স্থাপন করলো । এরপর থেকে ধীরে ধীরে সমাজে গভীরভাবে শির্কের বিস্তার ঘটতে থাকে।

তৎকালীন আরবদের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল গোত্রপ্রধান। যার কারণে বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হ’ত। গোত্রের মান মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত । তৎকালীন আরবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে খুবই উন্নত ছিল। পরিবারে পুরুষ ও মহিলাদের পারস্পরিক

সম্পর্ক ছিল মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের মান-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হ'ত। তাদের মর্যাদা হানিকর কোন অবস্থার উদ্ভব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যেত। মহিলাদের মর্যাদা এতই উঁচুতে ছিল যে, বিবদমান গোত্রগুলিকে একত্রিত করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনেও তারা সক্ষম হ'ত। অপরদিকে সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণীর আরবদের মধ্যে চার ধরনের বিবাহ প্রথা চালু ছিল। এক ধরনের ছিল অভিজাত শ্রেণীর মত পারস্পরিক সম্মতি ও মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতি। কিন্তু বাকী তিনটি পদ্ধতি ছিল বিবাহের নামে স্পষ্ট ব্যভিচার। তৎকালে দাসীদেরকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হত। তাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

আরব বাসীগণের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য । ত্বায়েফ, সিরিয়া, ইয়ামন প্রভৃতি উর্বর ও উন্নত এলাকা ছাড়াও সর্বত্র পশু-পালন জনগণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল। উট ছিল বিশেষ করে দূরপাল্লার সফরের জন্য একমাত্র স্থল পরিবহন। গাধা, খচ্চর মূলতঃ স্থানীয় পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ঘোড়া ছিল যুদ্ধের বাহন। মক্কার ব্যবসায়ীরা শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় দূরপাল্লার ব্যবসায়িক সফর করত। আর্থিক লেনদেনে সূদের প্রচলন ছিল। তারা চক্রবৃদ্ধি হারে পরস্পরকে সূদভিত্তিক ঋণ দিত। রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই ব্যবসায়ী কাফেলা লুট হ'ত। সেজন্য সশস্ত্র যোদ্ধাদল নিয়ে তারা রওয়ানা হ'ত। তবে কা'বাগৃহের খাদেম হওয়ার সুবাদে মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা বিশেষভাবে সম্মানিত ছিল এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকত। তাদের মধ্যে শিল্পের প্রচলন তেমন ছিল না । তাদের শিল্পের মধ্যে কেবল বস্ত্র, চর্ম, ধাতব ইত্যাদি শিল্পের প্রচলন দেখা যেত।

তাদের নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে দুটি বিপরীতমুখী ধারা একত্রে লক্ষ্য করা যেত। যেমন- একদিকে তাদের মধ্যে জুয়া, ব্যভিচার, মদ্যপান, হানাহানি, মারামারি হিংসা-বিদ্বেষ, হত্যা, প্রতিহিংসা-পরায়নতা লুটতরাজ ইত্যাদি পরিলক্ষিত হতো । তেমনি অন্যদিকে সততা, উদারতা, অতিথী-পরায়ণতা, দানশীলতা, আমানতদারিতা, প্রতিজ্ঞাপরায়নতা ইত্যাদি আরো অনেক মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যেত ।

আরবভূমি মরুবেষ্টিত হওয়ায় তা সর্বদা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল । ফলে এরা জন্মগতভাবে স্বাধীন ছিল। এই সময় আরবের দক্ষিণাংশে ছিল হাবশার সাম্রাজ্য, পূর্বাংশে ছিল পারস্য সাম্রাজ্য এবং উত্তরাংশের ভূখন্ডসমূহ ছিল রোম সাম্রাজ্যের করতলগত। সম্রাট শাসিত এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা সবাই ছিল ধর্মের দিক দিয়ে খ্রিষ্টান । যদিও প্রকৃত ধর্ম বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। মক্কা ও ইয়াসরিব (মদীনা) সহ আরবের বাকী ভূখন্ডের লোকেরা স্বাধীন ছিল। তাদের কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। তবে তারা গোত্রপতি শাসিত ছিল।

✐ রাসূলুল্লাহ সা:-এর পিতা-মাতা...

রাসূল সা: এর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা । তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব নিজ সন্তান আব্দুল্লাহর বিবাহের জন্য বনু যুহরা গোত্রের নেতা ওয়াহাবের কন্যা আমিনার সাথে তার বিবাহ দেন। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই ব্যবসা উপলক্ষে আব্দুল্লাহ মদিনা গমন করেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

✐ রাসূলুল্লাহ সা:-এর সৌভাগ্যময় জন্ম...

মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে ৯/১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের শুভ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন । তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন । ইবনে সাদ হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা:-এর মা আমিনা তাঁর জন্মের সময় তার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হতে দেখেছিল যা শামদেশের অট্টালিকা সমূহ আলোকিত করেছিল ।**(২)**

রাসূল সা: হওয়ার পর তাঁর মা আমিনা তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্মগ্রহণের সুসংবাদ প্রেরণ করেন । এই সুসংবাদ শোনামাত্রই আব্দুল মুত্তালিব নবজাতককে কোলে তোলে নিয়ে কাবা গৃহে প্রবেশ করলেন এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন । এবং তার নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ' ।

✐ শিশু রাসূল সা:-এর লালন-পালন...

তখনকার নগরবাসী আরবগণের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল। তারা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন-পালনের জন্য বেদুইন পরিবারের ধাত্রীদের হাতে শিশুদেরকে সমর্পণ করত । প্রথা অনুসারে শিশু রাসূল সা:-এর জন্যও ধাত্রীর অনুসন্ধান করা হয় এবং বনু সা'দ গোত্রের আবু যুয়াইবের কন্যা হালিমার কাছে তাঁকে সমর্পণ করা হয়। হালিমা যখন শিশুর রাসুল সা:-তার সাথে নিয়ে এলেন তখন তিনি ও তার স্বামী অনেক অলৌকিক ও বরকতময় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তারা যখন দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কা যান তখন তারা যে গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন তা ছিল খুবই দুর্বল এবং এত ধীরে চলছিল যে কাফেলার অন্যরা বিরক্ত হচ্ছিল । এমনকি তাদের সাথে যে উট ছিল সেটি এক ফোঁটা দুধও দিচ্ছিল না এবং তার যে শিশু সন্তান ছিল সে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছিল কিন্তু তার ক্ষুধা নিবৃত্ত

করার মতো দুধ তার বুকে ছিল না। পরে তারা যখন শিশু মুহাম্মাদ সা:-কে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো তখন তাঁকে কোলে নেওয়ার পর পরই তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল । শিশু মুহাম্মাদ সা: ও তাঁর দুধভাই হঠাৎ হালিমার গর্ভজাত সন্তান উভয়ে পরিতৃপ্তির সাথে দুধ পান করল । হালিমার স্বামী উটের দুধ দোহন করতে গিয়ে দেখলেন যে, তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তারা মক্কা ফেরত যাওয়ার সময় তাদের সেই দুর্বল গাধাটিই কাফেলার সকলকে পেছনে ফেলে সবার আগে ছুটে যেতে লাগলো । এছাড়াও তারা মক্কা থেকে ফিরে আসার পর তাদের বকরিগুলো চারণভূমি থেকে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধপরিপূর্ণ ওলান সহকারে বাড়ি ফিরে আসতো । কিন্তু অন্য লোকেরা এক ফোঁটাও দুধ পেতো না । অথচ তা ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা । এভাবে তারা একের পর এক অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হন।

দুধ মা হালিমার নিকট থাকাকালীন একবার রাসূল সা: এর বক্ষ বিদারনের ঘটনা ঘটে । আনাস রা: হতে বর্ণিত হয়েছে, একদিন বালক নবী সাঃ সঙ্গী সাথীদের সাথে যখন খেলাধুলা করছিলেন এমন সময় জিব্রাইল আ: সেখানে এসে উপস্থিত হন । তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিত করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ডটি বের করে আনলেন । তারপর তাঁর মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল । তারপর হৃদপিণ্ডটিকে একটি সোনার তস্তরীতে রেখে জমজমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন । এই ঘটনার পর দুধ মা হালিমা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর মার নিকট মক্কায় রেখে আসেন ।
যখন রাসূল সা:-এর বয়স ৬ বছর হল তখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে তাঁর মাতা আমিনা ইন্তেকাল করেন। মাতার ইন্তেকালের পর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব এর তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত পালিত হতে থাকেন । তিনি ছিলেন দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নয়নের মণি। তাঁর বয়স যখন আট বছর পূর্ণ হল
তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলেন । দাদার মৃত্যুর পর রাসূল সা: চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হতে লাগলেন ।

একবার বালক মুহাম্মাদ সা: ব্যবসা উপলক্ষে চাচার সাথে শাম দেশে (সিরিয়ায়) গমন করেন। তাদের কাফেলা যখন বুসরা এলাকায় পৌঁছলো তখন তারা সেখানে যাত্রা বিরতি করলো। সেখানে বাহীরা নামে এক খ্রিস্টান পাদ্রী বাস করত। তাদের
কাফেলা নিকট সেই পাদ্রী আগমন করলেন। বালক মুহাম্মাদ সা:-এর দেহাবয়ব আচরণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে এমনকি পিঠে দুই স্কন্ধের মাঝখানে মোহরে নবুওয়াত দেখে বাহীরা বুঝতে পারে যে, ইনি হচ্ছেন বিশ্ব মানবের মুক্তির দিশারী আখেরি নবী সা: । শুধু তাই নয় গির্জায় বসে বাহীরা অলৌকিক কিছু জিনিস দেখতে পায়। যেমন-মক্কার কাফেলা যখন আগমন

করছিল তখন সমগ্র কাবিলার মধ্যে একমাত্র বালক রাসূল সা: কেই এখনো মেঘ ছায়া দিচ্ছিল। এবং সেখানে এমন কোন বৃক্ষ কিংবা পাথর ছিল না যা তাকে সিজদা করেনি এ সকল জিনিস নবী-রাসূল ছাড়া সৃষ্টিরাজির আর অন্য কাউকে কখনো সিজদা করে না। অতঃপর বাহীরা আবু তালিবকে বিষয়টি অবগত করল এবং তাকে বলল, ইহুদীদের থেকে তাঁকে সাবধানে রাখতে। কারণ তারা যদি জানতে পারে তাহলে তাঁর ক্ষতি সাধন করতে পারে।

✎ খাদিজা রা:-এর সঙ্গে বিবাহ...

তৎকালীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নারী ছিলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। তিনি যখন যুবক রাসূল সা: এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও চারিত্রিক মহত্বের কথা জানতে পারলেন তখন তাঁর পণ্যসামগ্রী নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁকে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন। নবী সা: তাঁর এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পণ্য সামগ্রী ও দাস মাইসারাহ -কে সাথে নিয়ে সিরিয়ায় গমন করলেন । সিরিয়া হতে তাঁরা এত বেশি পরিমাণ অর্থ লাভ করলেন যা কোনদিনই ইতঃপূর্বে তাঁরা পাননি । এছাড়াও মাইসারাহর কাছ থেকে নবী সা: এর বিষয়ে অলৌকিক ঘটনা শুনে এবং তাঁর মিষ্টভাষীতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার পর নবী সা: এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার সুপ্ত বাসনা তাঁর মনে জেগে ওঠে। সুতরাং তিনি তাঁর বান্ধবী নাফিসার মাধ্যমে রাসূল সা: এর নিকট তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন।

অতঃপর তাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল। রাসূল সা: মোহরানা স্বরূপ স্ত্রী খাদিজা কে ২০টি উট প্রদান করেন । ওই সময় খাদিজা রা: এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর এবং রাসূল সা: এর বয়স ছিল ২৫ বছর । তিনি ছিলেন নবী সা: এর প্রথম সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অন্য কাউকে আর বিবাহ করেননি। খাদিজা রা: এর গর্ভে রাসূল সা: এর সন্তানদের মধ্যে ইব্রাহিম ছাড়া অন্যান্য সব সন্তান জন্ম লাভ করেন । তাঁদের প্রথম সন্তান ছিল কাসিম । তাই রাসূল সা: এর উপনাম হয়ে যায় 'আবুল কাসিম' । তারপর জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ ।

✎ পবিত্র কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ...

রাসূলুল্লাহ সা: এর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন কুরাইশগণ পবিত্র কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে তারা একত্র হয়ে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করল। তা হলো: কাবা গৃহ

নির্মাণে শুধু বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ ব্যবহৃত হবে এতে সুদ, ব্যভিচার ও হক নষ্ট করে অর্জন করা অর্থ ব্যয় করা যাবে না । এবার পুনঃনির্মাণের জন্য কা'বা গৃহ ভেঙে ফেলা প্রয়োজন । কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙে ফেলার কাজে হাত দেওয়ার সাহস কেউ পেল না । অবশেষে বনু মাখযূম গোত্রের ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিল । হাজরে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হলে এবার তা যথাস্থানে স্থাপন করা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। এমনকি ঝগড়া বিবাদ শুরু হল । অবশেষে প্রবীর নেতা আবু উমাইয়া ইমনুল মুগীরা তাদেরকে এ সিদ্ধান্ত দিল যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সবার আগে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন, তাঁর ওপরেই এই বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হবে । অতঃপর দেখা গেল সকলের প্রিয় পাত্র রাসূলুল্লাহ সা:-ই সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছেন । তখন লোকেরা তাদের বিবাদের বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি তাদের কাছে একখানা চাদর চাইলেন এবং তা মেঝের উপর বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে হাজরে আসওয়াদ তার ওপর স্থাপন করলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের নেতাদেরকে চাদরের প্রান্ত ধরে উত্তোলন করতে বললেন । তারা তাই করল। অতঃপর তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে যথাস্থানে রাখলেন এবং তার ওপর গাঁথুনি দিলেন ।

✍ রাসূলুল্লাহ সা: এর দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য...

ইবনে হিশাম বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের পুত্র মুহাম্মাদের পুত্র ইবরাহীম থেকে গুফরার আযাদকৃত দাস উমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন:

আলী ইবনে আবু তালিব যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করতেন তখনই বলতেন, "তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না, আবার খুব বেঁটেও ছিলেন না বরং তিনি উচ্চতায় মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর চুল অত্যধিক কুঞ্চিত ছিল না আবার একেবারে অকুঞ্চিতও ছিল না। বরং তা কিঞ্চিত কোঁকড়ানো। তিনি খুব বেশী স্থুল বা মোটা দেহের অধিকারী ছিলেন না। তাঁর মুখমণ্ডল একেবারে গোলাকার ও ক্ষুদ্র ছিল না। চোখ দুটো ছিল কালো। লম্বা ভ্র-যুগল, গ্রন্থির হাড়গুলো ও দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী হাড়টি ছিল উঁচু ও সুস্পষ্ট। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ছিল হালকা লোমে আবৃত। হাত ও পায়ের পাতা ছিল পুষ্ট, চলার সময় পা দাবিয়ে দিতেন না, মনে হতো যেন কোন নিম্ন ভূমিতে নামছেন। কোনদিকে ফিরে তাকালে গোটা শরীর নিয়ে ফিরতেন। তাঁর দুই স্কন্ধের মাঝখানে নবুওয়াতের সীল বা মোহর লক্ষণীয় ছিল। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠতম সাহসী, অতুলনীয় সত্যবাদী, সবচেয়ে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন, সবচেয়ে অমায়িক ও মিশুক। প্রথম নজরে তাঁকে দেখে

সবাই ঘাবড়ে যেতো।" তাঁর প্রশংসাকারী আলী (রা) বলেন, "তাঁর মত মানুষ তাঁর আগেও দেখিনি পরেও দেখিনি।”

✐ নবুওয়াত লাভ...

রাসূলুল্লাহ সা:-এর বয়স যখন চল্লিশে উপনীত হলো তখন আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ এবং গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা করে পাঠালেন । 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন,"আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করতে ও মানব জাতিকে তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত করতে মনস্থ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সা: নবুওয়াতের অংশ হিসেবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের সূর্যোদয়ের মতই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। এই সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্জনে অবস্থান করার প্রতি আগ্রহী করে দেন। একাকী নিভৃতে অবস্থান তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়ে ওঠে।”
ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। প্রতিবছর পুরো রমাদান মাসে খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু’মাইল দূরে অবস্থিত (জাবালে নূর) নূর পর্বতের হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এবং প্রতিবছর একটা মাস তিনি নির্জনে ইবাদত করে কাটাতেন । অবশেষে সেই মহান রাতটি উপস্থিত হল। তিনি তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন এবং এমন সময় আল্লাহর নির্দেশে জিব্রাইল আ: তাঁর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, “পড়ুন!” তিনি বললেন, “আমি পড়তে পারিনা।” তারপর তিনি তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ুন!” তিনি আবারও বললেন, “আমি পড়তে পারি না।” তারপর তৃতীয়বারের মতো তাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, “পড়ুন!” তিনি বললেন, “কি পড়বো?” জিবরাঈল আ: বললেন...

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴿١﴾خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿٣﴾
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ﴿٥﴾

“পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।”(সূরা আলাক: ১-৫)

তারপর ওহীর এই আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে রাসূল সা: কিছুটা ভীত ও অস্থির হয়ে স্ত্রী খাদিজার নিকট চলে এলেন এবং তাঁকে বললেন, "আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর ।" খাদিজা রা: তাঁকে বস্ত্রাবৃত করলেন। তারপর তাঁর সাথে হেরা গুহায় যা কিছু ঘটেছে সবকিছু তাঁকে খুলে বললেন । অতঃপর খাদিজা রা: তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না । কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার চেষ্টা করেন এবং অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন, যারা সত্যের পথে থাকে তাদেরকে আপনি সাহায্য করেন ।

এরপর খাদিজা রা: রাসূলুল্লাহ সা: কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এর কাছে গেলেন। সে সময় পরাকা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং আসমানী কিতাবের জ্ঞানে সুপন্ডিত ছিলেন । ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, "ভাতিজা! বলতো তুমি কি দেখেছো এবং শুনেছো ?" রাসূলুল্লাহ সা: তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন । সবকিছু শুনে ওয়ারাকা বললেন, "ইনি তো সেই মহাদূত যিনি মূসা আ:- এর কাছেও আগমন করেছিলেন । তুমি এটাও জেনে রাখো যে, তোমার বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে, তোমাকে নির্যাতন করা হবে এবং দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে এবং তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে । আমি যদি তখন জীবিত থাকি তবে অবশ্যই তোমাকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করব ।"

এরপর কিছুদিনের জন্য ওহী আসা বন্ধ থাকে। প্রথম ওই অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি কিছুটা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন । এরপর তিনি যখন মানসিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন । তখন জিব্রাইল আ: পুনরায় তার নিকট ওহী নিয়ে আগমন করলেন। একদা তিনি পথ দিয়ে হাঁটার সময় আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন । তখন আসমানের দিকে তাকাতেই তিনি প্রথমবারের মতো জিব্রাইল আ: কে নিজ আকৃতিতে দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন জিবরাইল আ: আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে একটি কুরসিতে উপবিষ্ট রয়েছেন । তাঁর ছিল ৬০০ ডানা যা থেকে ক্রমাগত মনিমুক্তা ঝরে পড়ছিল। এ দৃশ্য দেখে ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে তিনি পুনরায় খাদিজা রা: কে বললেন, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন,

يَآَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

"হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন । আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা

করুন । আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন । অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন ।"(সূরা আল মুদ্দাসসির:১-৫)
এরপর থেকে ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে ।

✍ ইসলামের দাওয়াত...

সূরা মুদ্দাসসির এর আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সা: পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করলেন । নবুয়তের প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যান। তিনি সর্বপ্রথম তাঁর নিকটতম যারা ছিল, যারা ছিল তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তাঁর দাওয়াতের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করা প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন: তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা:, তাঁর চাচা আবু তালিবের পুত্র হযরত আলী রা: (তাঁর বয়স তখন মাত্র ১০ বছর) এবং তাঁর সাওর গুহার সঙ্গী আবু বাকর সিদ্দিক রা: । এরপর থেকে যথাক্রমে আরও অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন । গোপনে তিন বছর দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর নবুয়তের চতুর্থ বছরে রাসূলুল্লাহ সা: প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হলেন । আল্লাহ তাঁকে এই নির্দেশ দেন, "হে নবী! এখন আপনি উচ্চকণ্ঠে প্রচার শুরু করুন এবং মুশরিকদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।" তিনি আরো বলেন,

وَ اَنۡذِرۡ عَشِیۡرَتَکَ الۡاَقۡرَبِیۡنَ ﴿۲۱۴﴾ۙ وَ اخۡفِضۡ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲۱۵﴾ۚ فَاِنۡ عَصَوۡکَ فَقُلۡ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۱۶﴾ۚ

"হে নবী! আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের কে সতর্ক করুন। আর আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি অনুকম্পাশীল ও সদয় থাকুন । আর বলুন, আমি প্রকাশ্য সতর্ককারী।"(সূরা আশ শু'আরা:২১৪-২১৬)

অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রকাশ্যে সকলকে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন । তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে নিয়ে যতক্ষণ না রাসূল সা: তাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করেননি । যখনই তিনি তাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করেন তারা তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে লাগলো। এমনকি তারা তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে তাঁর দাওয়াতী কাজ বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে লাগলো এবং তাঁকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলল । কিন্তু আবু তালিব ছিলেন স্বীয় ভাতিজার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি

কুরাইশদের বিভিন্ন আক্রমণের মুখে রাসূলুল্লাহ সা:-কে রক্ষা করতে থাকলেন এবং তার পাশে দাঁড়ালেন ।

কুরাইশগণ যখন দেখলো যে, মুহাম্মাদ সা:-কে কোনভাবেই দ্বীনের দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো । তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে গালিগালাজ করতে লাগলো। তাঁকে কবি, জাদুকর, জ্যোতিষী ও পাগল বলে অপবাদ দিতে থাকলো । এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিল । তারা তাঁর নামে মিথ্যা অপপ্রচার করতো এবং তাঁকে বিভিন্ন আজেবাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করত। শুধু তাই নয় যে সমস্ত লোকেরা ইসলাম কবুল করেছিল তাঁদের উপর তারা অমানবিক ও অসহনীয় নির্যাতন করত । তারা তাঁদেরকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করত। তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করলে জুলুম অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে দিত । একসময় তারা রাসূল সা: এর নিকট কিছু প্রস্তাব পেশ করলো। কুরাইশ সরদার উতবা ইবনে রাবিআ তাঁকে বলল, "ভাতিজা তুমি যে নতুন দাওয়াত দিতে শুরু করেছো এর দ্বারা যদি বিপুল সম্পদ লাভ করা তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে আমরা তোমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তোমাকে আমাদের ভেতরে সবচেয়ে বিত্তশালী বানিয়ে দেবো। আর যদি তুমি পদমর্যাদা লাভ করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেবো । আর যদি তুমি রাজত্ব চাও তাহলে তোমাকে এ দেশের রাজা বানিয়ে দেব । আর যদি এমন হয়ে থাকে যে তোমার কাছে জ্বীন আসে তাকে তুমি হঠাতে পারছ না তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসা করাবো ।" অতঃপর রাসূল সা: তাকে সূরা ফুসসিলাত তিলাওয়াত করে শোনালেন । এদেশে বিস্ময়াবিভূত হল এবং তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল।

এরপর কুরাইশরা তাঁর কাছে কতক বিষয়ের দাবি করল, তারা তাঁকে আল্লাহর নিকট চাইতে বলল, তিনি যেন পর্বতগুলোকে তাদের আবাসভূমি থেকে সরিয়ে তাদের আবাসভূমিকে প্রশস্ত করে দেন এবং তাদের দেশে নদনদী প্রবাহিত করে দেন । তিনি যেন তাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দেন । অথবা তিনি যেন তাঁর নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন যিনি তাদের সামনে রাসূলের কথা সত্য বলে সাক্ষ্য দেবেন । তারা আর বললো, কয়েক টুকরো মেঘ তাদের মাথার উপর ফেলে দিতে এবং তিনি যদি এটা না করেন তবে তারা ঈমান আনবে না। কিন্তু তাদের এই মূর্খতাপূর্ণ দাবি আল্লাহর রাসূল সা: কিছুতেই মেনে নিলেন না।

🖎 হামযা ও উমার রা: এর ইসলাম গ্রহণ...

- **হামযা রা:...**

একবার আবু জাহেল সাফা পর্বতের নিকটে নবী সা: এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে গালিগালাজ করল এবং অপমানসূচক কথাবার্তা বলল। আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের এক দাসী এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে হামযা রা: এর কাছে
উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলো । ঘটনা শুনে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন । এক মুহূর্তে বিলম্ব না করে আবু জাহেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদে হারামে আবু জাহেলকে খুঁজে পেলেন । তার কাছে গিয়ে তিনি ধমক দিয়ে তাকে প্রচন্ড আঘাত করে গুরুতরভাবে যখন করে দিলেন । এবং তাকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন । এই ঘটনার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরে ইসলাম এর প্রতি ভালবাসা জোরদার করে দেন। ফলে তিনি ইসলাম কবুল করেন। গ্রহণের ফলে মুসলিমদের শক্তি ও সম্মান উভয়ই বৃদ্ধি পেল।

- **উমার রা:...**

হামযা রা: ইসলাম কবুলের মাত্র তিনদিন পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন । প্রথমদিকে তিনি ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু। একবার তিনি রাসূল সা: কে হত্যা করার জন্য কোষ মুক্ত তরবারি হাতে বের হন । পথিমধ্যে তিনি যখন শুনতে পেলেন তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন তিনি প্রচন্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং তাদের বাড়ি গেলেন । তাঁরা তখন সূরা ত্বহা পাঠ করছিলেন। অতঃপর তাঁদেরকে প্রহার করতে লাগলেন। এক সময় তাঁর বোন ফাতিমাকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে তাঁর মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। এটি দেখি তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁদের পাঠকৃত বইটি চাইলেন । তাঁর বোন বললেন, তুমিতো অপবিত্র । অপবিত্র লোক এটির স্পর্শ করতে পারেনা । উমর রা: গোসল করে পবিত্র হয়ে সুরা ত্বহা পাঠ করলেন । অতঃপর রাসূল সা: এর নিকট গিয়ে ইসলাম কবুল করলেন। ইবনে মাসউদ বলেছেন যে, "যতদিন পর্যন্ত উমার রা: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি ততদিন পর্যন্ত আমরা কা'বা গৃহের নিকট সালাত আদায় করতে সাহস করিনি ।"

✍ আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত...

দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। যখন তাদের জুলুমের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেল । তখন নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচানোর তাগিদে রাসূল সা: তাঁর সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করলেন । অতঃপর সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন । ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এটাই ছিল প্রথম হিজরত ।

✍ আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত...

প্রথমবার আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজির সাহাবীগণ শুনলেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে । কিন্তু বাস্তবে এর কিছুই ছিল না । মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে তাঁরা মক্কা অভিমুখে রওনা দিলেন । তাঁরা যখন মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন জানতে পারলেন যে তারা যে কথা শুনেছেন তা আসলে সঠিক নয়। ফলে তাঁরা মক্কাবাসীর কারো সহযোগিতা নিয়ে অথবা গোপনে নগরীতে প্রবেশ করলেন । পুনরায় কুরাইশরা তাঁদের ওপর অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন শুরু করল । অতঃপর রাসূল সা: পুনরায় তাঁদেরকে হিজরত করার পরামর্শ দিলেন । আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরাইশরা ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো ।

✍ রাসূলুল্লাহ সা:-কে আবু জাহেলের হত্যার প্রচেষ্টা...

রাসূল সা: উতবা ইবনে রাবিআর প্রস্তাবে সম্মত না হলে কুরাইশরা তখন যে সকল বিষয়ের দাবি করেছিল তাতেও যখন তিনি সম্মত হলেন না এরপর আবু জাহেল কুরাইশদের নিয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল । সে অনুযায়ী সকাল হলে আবু জাহল তার ঘোষণার অনুরূপ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা:-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ যথা নিয়মে আগমন করলেন এবং সালাতে রত হলেন। কুরাইশগণও সেখানে উপস্থিত হয়ে আবু জাহলের কথিত কাণ্ড দেখার জন্য অপেক্ষামান রইল। যখন রাসূলুল্লাহ সা: সিজদায় গমন করলেন তখন আবু জাহল পাথর উঠিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু নিকটে পৌঁছে পরাস্ত সৈনিকের মতো স্ববেগে পশ্চাদপসরণ করল। এ সময় তাকে অত্যন্ত বিবর্ণ এবং ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। তার দু'হাত পাথরের সঙ্গে শক্তভাবে চিমটে লেগে গিয়েছিল। পাথরের গা থেকে হাত ছাড়াতে তাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে এবং বেগ পেতে হয়েছিল। এ দিকে কুরাইশগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক

লোক দ্রুত তার নিকট এগিয়ে আসে এবং বলতে থাকে, 'আবুল হাকাম। ব্যাপারটি হল কী? কিছুই যেন বুঝে উঠছি না।'

সে বলল, 'আমি রাত্রিবেলা যা বলেছিলাম তা করার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম তখন একটি উট আমার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। হায় আল্লাহ। কক্ষনো আমি এমন মস্তক, এমন ঘাড় এবং এমন দাঁতবিশিষ্ট উট দেখি নি। মনে হল সে যেন আমাকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

ইবনু ইসহাক বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'উষ্ট্রের রূপ ধারণ করে সেখানে ছিলেন জিবরাঈল আমিন। আবু জাহল যদি আমার নিকট যেত তাহলে তার উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়ে যেত।'

✍ পূর্ণাঙ্গ বয়কট...

কুরাইশ মুশরিকদের সকল অপচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল এবং আবু তালিব এর কাছে গিয়েও যখন তারা কোনো সুবিধা করতে পারল না তখন তারা সকলে মিলে সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা বনু হাসিম ও বনমুক্তারিবের সঙ্গে সকল প্রকারের সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ করে দেবে । তারা এই বর্জন বা বয়কটের দলিল স্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করলো এবং তা কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখল। এই অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করেছিল মানসুর বিন ইকরামা। রাসূলুল্লাহ সা:- এর বদ দু'আয় তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল । এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সকলে আবু তালিবের সাথে তার গিরিবর্তে প্রবেশ করলো। গিরিবর্তে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত করুন হয়ে গেল । কেননা তাদের নিকট খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ সামগ্রী ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়েছিল । দুই একজন সহৃদয় কুরাইশ আতি এর গোপন সহযোগিতা ছাড়া কিছুই তাদের কাছে পৌঁছতো না । এমন সংকটপূর্ণ অবস্থায় অবশেষে দীর্ঘ ২ কিংবা ৩ বছর পর নবুওয়াতের ১০ম বর্ষে মুহররম মাসে বয়কটের পরিসমাপ্তি ঘটে । আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তারা যে অঙ্গীকারনামা লিখেছিল তা পোকায় খেয়ে ফেলে । তাতে শুধু "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" এই কথাটি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল । বাকি সম্পূর্ণ চুক্তিপত্র নষ্ট হয়ে যায় । এছাড়াও অঙ্গীকারনামা বাতিল করার জন্য একদল কুরাইশ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন হিশাম বিন আমর নামক ব্যক্তি।

✍ শোকের বছর...

গিরিবর্তে অন্তরিণাবস্থা শেষ হওয়ার ছয় মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষেই রাসূল সা: এর প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। জীবদ্দশায় চাচা আবু তালেব ছিলেন তার সহায় ও ঢাল স্বরূপ । তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর উপর কুরাইশদের বিভিন্ন অত্যাচার প্রতিরোধ করতেন এবং তাঁকে সার্বিকভাবে সহায়তা দিতেন। তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ও রাসূল সা: তাঁকে কালিমা পাঠ করতে অর্থাৎ ইসলাম কবুল করতে বলেন । কিন্তু আবু জাহেল ও অন্যান্য কুরাইশদের উপস্থিতিতে তাদের কথার প্ররোচনায় পড়ে শেষ পর্যন্ত আবু তালিব ঈমান আনতে ব্যর্থ হলেন। নবী করীম সা: বললেন,"আমি যতক্ষণ বাধা প্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো।" এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন,
(مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيم) 'নাবী ও মু'মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে তারা আত্মীয়- স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।' (আত্-তাওবাহ:১১৩)

অতঃপর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর শোক না কাটতেই একই বছর রমাদান মাসে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা রা: ইন্তেকাল করেন । মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর । খাদিজা রা: ছিলেন রাসুল সাঃ এর জীবনে আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ । তিনি ছিলেন তাঁর এক পরম সত্যনিষ্ঠ উপদেষ্টা । দাম্পত্য জীবনে তিনি নবী সা:-কে সাহচর্য, সেবা যত্ন, বিপদে-আপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাবের সময় অর্থ দিয়ে ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে আগলে রেখেছেন ।

সহীহুল বুখারীতে আবু হুরায়রা রা: হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল আ:নাবী কারীম সা:-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল। ইনি খাদীজা রা: আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না। **(৩)**

প্রথমে প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিব এরপর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা: এর মৃত্যু রাসূল সা:-এর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে । তারা মারা যাওয়ার পর মুশরিকরা তাঁর ওপর যে জুলুম নির্যাতন এতদিন চালিয়ে আসছিল এবার তা বহু গুনে বৃদ্ধি করে দিল । ইবনে ইসহাক বর্ণনা

করেছেন, আবু তালিব এর মৃত্যুর পর কুরাইশগণ রাসূল সা: কে এত কষ্ট দেন যা আবু তালিবের জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এমনিভাবে একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে সেই বছরটিকে বলা হয় 'আমুল হুযন' বা শোকের বছর ।

✐ রাসূল সা:-এর তায়েফ গমন...

স্ত্রী ও চাচার মৃত্যু পর এবার তিনি স্থির করলেন তায়েফ বাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার । তাই তিনি তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসা রা: কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তায়েফ মক্কা থেকে আনুমানিক ৬০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত । তায়েফে গমন করে তিনি সাকীফ গোত্রের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম প্রচারে সহায়তা করার অনুরোধ জানালেন । কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তাঁকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন । রাসূল সা: তায়েফে ১০ দিন অবস্থান করেন । এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন । কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে । শুধু তাই নয় যখন তিনি তায়েব ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন তারা তাকে উত্যক্ত, অপমানিত ও কষ্ট দেয়ার জন্য গোত্রের কিছু মূর্খ, নির্বোধ কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা রাসুল সা: কে অশ্রাব্য অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গালমন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে লাগলো । এর ফলে তাঁর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল । চলতে চলতে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন উতবা ও শাইবা ইবনে রাবিআর বাগানে একটি গাছে ছায়ায় গিয়ে বসলেন । একটু শান্ত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ فِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلُّ عَلَى سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِك.(

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু, তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে

তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাষিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই।"

✍ মে'রাজের ঘটনা...

ইবনে ইসহাক বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "বাইতুল মাকদাসের অনুষ্ঠানাবলী সমাপ্ত হলে আমার সামনে ঊর্ধাকাশে আরোহণের সিঁড়ি হাজির করা হলো। এমন সুন্দর কোন জিনিস আমি আর কখনো দেখিনি। মৃত্যুর সময় হলে মানুষ এই সিঁড়িই দেখতে পায় এবং এর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গী (জিবরাইল) আমাকে ঐ সিঁড়িতে আরোহণ করালেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় গিয়ে থামলেন। এ দরজাকে 'বাবুল হাফাযাহ' বা রক্ষকদের দরজা বলা হয়। এখানে ইসমাঈল নামক একজন ফিরিশতা কর্তব্যরত রয়েছেন। তাঁর অধীনে রয়েছে বার হাজার ফেরেশতা এবং এইসব ফেরেশতার প্রত্যেকের অধীনেও আবার বার হাজার করে ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ.

"তোমার প্রভুর সৈন্য সামন্তের সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" (সুরা আল মুদ্দাসির)

স্মৃতঃপর যখন আমাকে নিয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন তখন ঐ ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে জিবরীল, ইনি কে?' তিনি বললেন, 'ইনি মুহাম্মাদ।' ফেরেশতা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি কি নবী?' জিবরীল বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি আমার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন।"

প্রথম আকাশে প্রবেশের পর আমি দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি বসে আছেন। তাঁর কাছে সকল মৃত মানুষের আত্মা হাজির হচ্ছে। কোন কোনটা হাজির হলে তিনি খুব খুশী হচ্ছেন এবং প্রশংসা করে বলছেন, 'এটি একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ থেকে নির্গত হয়েছে।' আবার কোন কোনটা হাজির বলে তিনি চেহারায় বিরক্তি প্রকাশ করে বলছেন, 'আহ! এটি একটি অপবিত্র আত্মা যা একটি পাপপংকিল দেহ থেকে নির্গত হয়েছে।' আমি জিবরাইলকে

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরাইল, ইনি কে?' জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম (আ)। তাঁর কাছে তাঁর সন্তানদের আত্মা হাজির করা হয়। কোন মুমিনের আত্মা দেখলে তিনি আনন্দিত হয়ে বলেন, 'এটি একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ থেকে বেরিয়েছে।' আর কোন কাফিরের আত্মা দেখলে তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন, তাকে অপছন্দ করেন এবং তার প্রতি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এটি একটি পাপাত্মা যা কোন পাপিষ্ঠ দেহ থেকে নির্গত হয়েছে।'

অতঃপর কতগুলো লোক দেখলাম। তাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত এবং তাদের হাতের মুঠোয় দগদগে জ্বলন্ত ছোট ছোট পাথর টুকরা রয়েছে। সেগুলো তারা মুখে পুরছে। আর পরক্ষণেই তা মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারী।'

এরপর আরো কিছু সংখ্যক লোক দেখলাম। তাদের পেটের মত বীভৎস আকৃতির পেট আর কখনো দেখিনি। দেখলাম, ফেরাউনের সহযোগীদের যে পথ দিয়ে দোযখে নেয়া হচ্ছে, সেই পথের ওপর তারা ৩৪ অবস্থান করছে। তারা পিপাসা-কাতর উটের মত ছটফট করছে। আর ফিরাউনের দোযখগামী অনুসারীরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে যাচ্ছে তথাপি সেখান থেকে একটু সরে বসবার ক্ষমতাও তাদের নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা সুদখোর।

অতঃপর আরো একদল লোক দেখলাম। তাদের সামনে উৎকৃষ্টমানের পুষ্ট গোশত রয়েছে। আর তার পাশেই রয়েছে উৎকট দুর্গন্ধ যুক্ত খারাপ গোশত। অথচ তারা ভাে গোশত বাদ দিয়ে খারাপ গোশত খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, এর করা?' তিনি বললেন, 'এরা সেই সব লোক যারা বৈধ স্ত্রী থাকতে নিষিদ্ধ স্ত্রী লোকের কাছে যায়।'

অতঃপর কিছুসংখ্যক নারীকে দেখলাম তাদের স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা সেই সব যারা ব্যাভিচারের মাধ্যমে অন্যের ঔরসজাত সন্তান স্বামীর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। এরপর তিনি দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করালেন। সেখানে দুই খালাতো ভাই ঈসা (আ) ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারীয়ার (আ) সাক্ষাত পেলাম।

অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে তৃতীয় আকাশে আরোহণ করালেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। আমি বললাম, 'হে জিবরীল, 'ইনি কে?' তিনি বললেন, 'ইনি ইয়াকুবের (আ) পুত্র ইউসুফ (আ)।'

অতঃপর চতুর্থ আকাশে আরোহণ করে সেখানে আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। জিবরাইল জানালেন ইনি ইদ্রিস (আ)। অতঃপর পঞ্চম আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে দেখলাম, সাদা চুল ও দীর্ঘ শশ্মশ্রুধারী এক বৃদ্ধ। অত সুন্দর বৃদ্ধলোক আমি আর কখনো দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, ইনি কে?' তিনি বললেন, 'তিনি স্বজাতির কাছে প্রিয় হারুন ইবনে ইমরান (আ)'। অতঃপর ষষ্ঠ আকাশে পৌছলাম। সেখানে দেখলাম বাদামী রংয়ের লম্বা নাক বিশিষ্ট এক দীর্ঘাঙ্গী পুরুষ, যেন শানুয়া গোত্রের কোন লোক। আমি বললাম, 'জিবরাইল, ইনি কে?' জিবরাইল বললেন, 'তিনি আপনার ভাই মূসা ইবনে ইমরান (আ)।'

অতঃপর আমাকে সপ্তম আকাশে আরোহণ করালেন। সেখানে দেখলাম, বাইতুল মামুরের দরজার কাছে একটি চেয়ারে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) স্বয়ং তাঁর সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। বাইতুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে এবং তারা আর ফিরে আসে না। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল, ইনি কে?" তিনি বললেন, 'তিনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ)।'

অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঈষৎ কালো ঠোঁট বিশিষ্ট একটি পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কার জন্য?' সে বললো, 'যায়িদ ইবনে হারেসার জন্য।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ ইবনে হারেসাকে এই সুসংবাদটি জানিয়ে দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এরপর আমি ফিরে এলাম। আসার পথে মুসা ইবনে ইমরানের আ: এর সাথে দেখা হলো। বস্তুতঃ তিনি তোমাদের একজন বন্ধু। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার ওপর কয় ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়েছে?” আমি বললাম, 'প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত।' মুসা বললেন, নামায় বড় কঠিন কাজ। তোমার উম্মাত খুবই দুর্বল। তুমি আল্লাহর কাছে ফিদেখ, মামায় তোমার ও তোমার উম্মাতের জন্য দায়িত্ব আরো হালকা করে দিতে বলাও এবং আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম এবং আমার ও আমার উম্মাতের দায়িত্ব হালকা করে দিতে অনুরোধ করলাম আল্লাহ দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। অতঃপর ফিরে আসলাম। মুসার সাথে আবার দেখা হলো। তিনি আবার আগের মত বললেন। আমি আবার গিয়ে আল্লাহকে নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন জানালাম। আল্লাহ আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি ক্রমাগত আমাকে পরামর্শ দিতে লাগলেন।

যখনই তাঁর কাছে ফিরে যাই, তিনি বলেন, 'যাও, আরো কমিয়ে দিতে বলো। এভাবে কমাতে কমাতে দিনে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাকি রইলো। এবারও মূসার (আ) কাছে ফিরে এলে তিনি আরো কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, 'বহুবার আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়েছি এবং কমিয়ে দিতে বলেছি। আমি লজ্জাবোধ করছি। তাই আর ফিরে যেতে পারবো না।'

অতএব যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঈমান ও সতর্কতার সাথে পড়বে, সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সওয়াব পাবে।" (সিরাত ইবনে হিশাম)

✍ আকাবার প্রথম বাইয়াত...

নবুয়তের একাদশ বর্ষে হজের মৌসুমে ইয়াসরিবের ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে **১২** জন লোক মক্কায় এলো এবং আকাবায় উপস্থিত হয়ে রাসূল সাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন । এবং তারা ইসলাম গ্রহণপূর্বক অরুন ইসলামিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করলেন । এই অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠানটিকেই আকাবার প্রথম বাইয়াত বলা হয় ।
'আকাবাহর এ অঙ্গীকার নামার ঘটনা সহীহুল বুখারী শরীফে 'উবাদাহ বিন সামিত প্রো থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ) বলেছেন, 'এসো, আমার নিকট এ কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবেনা, হাত পায়ের মাঝে মন গড়া কোন অপবাদ আনবে না এবং কোন ভাল কথায় আমাকে অমান্য করবে না। যারা এ সকল কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনটি করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয় তবে সেটা তার মুক্তিলাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এ সবের মধ্যে কোন কিছু করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছের উপর ছেড়ে দেয়া হবে, চাইলে তিনি শাস্তি দিবেন, নচেৎ ক্ষমা করে দিবেন। 'উবাদাহ বলেছেন এ সব কথার উপরে আমরা নাবী)-এর নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। **(8)**
মক্কায় আগত ইয়াসরিবের এই দলটি যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল তখন রাসুল সাঃ তাদের সাথে মুসআব ইবনে উমাইরকে প্রেরণ করলেন তাদেরকে কুরআন পড়ানো ইসলামের আহকাম এবং বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য । ইয়াসরিবের মুসলিমদেরকে তিনি নামাজও পড়াতেন । তিনি মদিনার শিক্ষা গুরুরূপে অভিহিত ছিলেন ।

🖎 আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত...

নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মক্কায় হজ পালনের উদ্দেশ্যে ৭০ জনেরও অধিক
মুসলিম মক্কায় আগমন করেন। তারা নিজ গোত্রের মুশরিকদের সাথে হজ উপলক্ষে মক্কায় এসেছিলেন । তারা আগামী তাসফিকের মধ্যবর্তী দিবাগত রাতের এক ত্রিতে অংশ অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত স্থান আকাবায় একত্র হয় । এরপর রাসূল সা: তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব কে সাথে নিয়ে সেখানে এলেন । তাঁরা বৈঠকে বসলে সর্বপ্রথম আব্বাস রা: তাঁদের সাথে কথা বললেন। এরপর রাসুল সা: কথাবার্তা বললেন। তাদের মধ্যে থেকে ১২ জন নকিব বা আহ্বায়ক নির্বাচন করলেন । যিনি সর্বপ্রথম রাসূল সা: এর হাত ধরে বায়াত করেন তিনি বারা ইবনে মা'রূর রা: । তারপর একে একে সকলে বাইয়াত গ্রহণ করেন ।

🖎 রাসূলুল্লাহ সা:-এর হিজরত...

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা: মক্কার মুসলিমদেরকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন । ফলে তারা দলে দলে হিজরত করতে আরম্ভ করলেন । আর রাসূল সা: নিজে মদিনায় হিজরতের জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন । সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ রা: ।

সাহাবীগন মদিনায় হিজরত করে চলে গেলে মক্কায় রাসূল সাঃ এর সাথে আলী ইবনে আবু তালিব, আবু বাকর সিদ্দিক রা: ও মুষ্টিমেয় কয়জন সাহাবা ছাড়া আর কেউ মক্কা ছিলেন না । এদিকে কুরাইশগণ তাদের পরামর্শগৃহ দারুন নাদওয়ায় সমবেত হল। তারা সকলেই নবী সা: এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হলো । এক এক জন একেক প্রস্তাব করলো এবং সর্বসম্মতিক্রমে তারা নবী সা: কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল ।
তৎক্ষণাৎ জিবরাইল আ: তাদের সেই ষড়যন্ত্রের কথা রাসুল সা: কে জানিয়ে দিলেন এবং তাকে তাঁর বিছানায় ঘুমাতে নিষেধ করলেন । তিনি আলী রা: কে তাঁর বিছানায় তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে বললেন । রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে ঘাতকের দল রাসূল সা: এর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলো। ঘাতক দলে আবু জাহেলও ছিল । তারপর রাসূল সা: গৃহের বাইরে গমন করলেন এবং এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন তাই তারা তাঁকে আর দেখতে পেল না । তখন তিনি সূরা ইয়াসিন এর আয়াতসমূহ পাঠ করছিলেন। এরপর

তিনি আবু বাকর রা: এর গৃহে গমন করলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করলেন । আবু বাকর রা: কে সাথে নিয়ে রাসূল সা: মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত সাওর নামক পর্বতের গুহায় তিন দিন অবস্থান করেন । কুরাইশরা তাঁদের খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হল ।
তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবার জন্য আবু বাকর সিদ্দিক রা: তাঁর ভৃত্য আমের ইবনে ফুয়াইরাকে তাদের সাথে নিলেন ।

হিজরতকালে পথিমধ্যে তাঁরা কুবায় অবস্থান করেন । রাসূল সা: কুবায় কুলসুম বিন হাদম কিংবা সা'দ ইবনে খাইসামার মেহমান হয়েছিলেন । সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এই চার দিন বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রে রাসূল সা: অবস্থান করেন । এ সময় তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন । অতঃপর আল্লাহ নির্দেশে তিনি শুক্রবার কুবা ত্যাগ করেন । বনু সালেম ইবনে আওফের আবাসস্থানে পৌঁছে জুমার নামাজ আদায় করেন । এখানেই তিনি মদিনার প্রথম জুমার নামাজ আদায় করলেন ।

জুমার নামাজের শেষে নবী সা: মদিনায় প্রবেশ করলেন । সেদিন থেকেই এ শহরকে মদিনাতুররাসূল বা রাসুলের শহর বলা হয় । সংক্ষেপে মদিনা । সেখানকার সকলেই যাচ্ছিল যেন তিনি তাদের মেহমানদারিত্ব গ্রহণ করেন । তাই তারা তাঁর উটনীর লাগাম ধরে নিতে লাগলো । কিন্তু রাসূল সা: তাদেরকে তার পথ ছেড়ে দিতে বললেন । কেননা সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত উটনী। বনু মালিক ইবনে নাজ্জারের বাসস্থানের কাছে এসে উটনী হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সেখানেই পরবর্তীকালে মসজিদে নববীর প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয় । ওই স্থানের মালিক ছিল দুইজন এতিম বালক । তিনি ওই স্থানটি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করলেন। এরপর রাসূল সা: ওই স্থানে মসজিদ নির্মাণে আদিষ্ট হলেন । তাঁর মসজিদ ও ঘরবাড়ি তৈরি হওয়া পর্যন্ত আবু আইয়ুবের বাড়ি অবস্থান করলেন । তিনি মদিনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র সম্পাদন করেন এবং এর মাধ্যমে ইহুদিদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি প্রদান ও গ্রহণ করেন । এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

✍ যুদ্ধের অনুমতি...

কুরাইশ মুশরিকগণ মদিনার মুহাজিরদের উপর তখনও বিদ্বেষপরায়ণ ও ক্রমাগত তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে যাচ্ছিল । এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন এবং এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿۳۹﴾

“যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে । আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম ।”(সূরা হাজ্ব:৩৯)

✍ সারিয়্যা ও গাযওয়া সমূহ...

মদিনা হিজরতের পর মুসলিমগণ বিভিন্ন সারিয়্যা ও গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেন সেসবের মধ্যে বদরের যুদ্ধের পূর্বের উল্লেখযোগ্য সারিয়্যা ও গাযওয়া হলো- গাযওয়ায়ে আবওয়া বা ওয়াদ্দান অভিযান, সারিয়্যাতু রাবিগ বা রাবিগ অভিযান (উবাইদা ইবনু হারিসের নেতৃত্বে), সারিয়্যাতু সিফিল বাহর বা সমুদ্র উপকূলের প্রেরিত বাহিনী (হামযা রা: এর নেতৃত্বে), গাযওয়ায়ে বুয়াত বা বুয়াত অভিযান, গাযওয়ায়ে যুল উশাইরাহ বা উশাইরাহ অভিযান, সারিয়্যায়ে খাররার (সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে), গাযওয়ায়ে সাফওয়ান, নাখলাহ অভিযান (আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে) ।

✍ বদরের যুদ্ধ...

এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল এই যে, একদিন রাসূল সাঃ খবর পেলেন যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোরাসদের একটি বিরাট বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে সে কাফেলায় কুরাইশদের প্রচুর ধনসম্পদ এবং বাণিজ্যিক সম্ভার ছিল। সেই কাফেলাকে পাকড়াও করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম মুসলিমদেরকে পাঠালেন । কিন্তু আবু সুফিয়ান ছিল অত্যন্ত চতুর ও সচেতন ব্যক্তি। কোনভাবে তিনি বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন । কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার কথা কুরাইশদের কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি দামদাম ইবনে আমর গিফারীকে মক্কা প্রেরণ করলেন । এই খবর শুনে মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলো । একমাত্র বনু আদি গোত্র ছাড়া অন্য সকল গোত্র এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি নিল । অপরদিকে রাসূল সা:ও তাঁর সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন । এরই মাঝে আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে মক্কা পৌঁছে যায় । এরপর দুই দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো ।

এই যতটি সংঘটিত হয় ১৭ই রমাদান, শুক্রবার সকাল বেলা। এই যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ মতান্তরে ৩১৪ বা ৩১৭ । যার মধ্যে মুহাজির ছিল ৮২ বা ৮৩ বা ৮৬ জন এবং ৬১জন আওস গোত্রীয় আনসার এবং ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রীয় আনসার । তাদের ঘোড়া সংখ্যা ছিল দুইটি এবং উট সংখ্যা ছিল ৭০ টি । সার্বিক নেতৃত্বের পতাকা প্রদান করা হয় মুসআব ইবনে উমায়ের রা: কে। অপরদিকে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০ । তাদের সাথে ছিল ১০০ টি ঘোড়া এবং ৬০০ লৌহ বর্ম । কুরাইশ সেনাদের সর্বাধিনায়ক ছিল আবু জাহেল । এই যুদ্ধে তাকে হত্যা করা হয়। এবং বড় বড় কুরাইশ নেতা যাদের এ যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল যুদ্ধ শেষে তাদের মৃতদেহ একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য জয়লাভ করে। মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন এবং ৭০ জন কুরাইশ নিহত হয় ও ৭০ জনকে বন্দী করা হয় । তাদের কাউকে মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় আবার কাউকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয় । যাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রসূল সা: এর কন্যা যায়নাবের স্বামী আবুল আস ইবনে রাবী । মুশরিকদের থেকে যে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। তার পরিমাণ ছিল বন্দিপ্রতি এক থেকে চার হাজার দিরহাম ।

✐ বদর যুদ্ধ পরবর্তী ও উহুদ যুদ্ধ পূর্ববর্তী অভিযান সমূহ...

বদর যুদ্ধের পরে যেসব অভিযান সংঘটিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: গাযওয়ায়ে বনু সুলাইম বা বনু সুলাইম অভিযান, গাযওয়ায়ে সাওয়ীক বা ছাতুর অভিযান, যূ-আমর অভিযান, গাযওয়ায়ে বাহরান বা বাহরানের ফুরু অভিযান, গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা এবং যায়িদ ইবনে হারিসার কারাদা অভিযান ।

✐ উহুদ যুদ্ধ...

বদর যুদ্ধে মক্কার কুরাইশ কাফিরদের পরাজয় ও অপমানের গ্লানি এবং তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যা এসব কারণে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রোধের আগুনে জ্বলছিল । তাই এর প্রতিশোধ স্বরূপ তারা পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল । এই যুদ্ধে কুরাইশদের জন্য সংখ্যা ছিল ৩০০০ । কিছু সংখ্যক মহিলা কেও তারা সঙ্গে নিল। তাদের সঙ্গে ছিল তিন হাজার উট ও ২০০ ঘোড়া এবং ৭০০ লৌহবর্ম। তাদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। অপরদিকে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০০। তাদের পতাকা ছিল মুসআব ইবনে উমায়ের এর হাতে । এই যুদ্ধে রাসুল সাঃ সুনিপন তীরন্দাজদের ৫০ জনের একটি দল নির্বাচন করেন । সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা: । যুদ্ধে রাসূল সা: এর চাচা হামযা রা:

এবং মুসআব ইবনে উমায়ের রা: সহ ৭০ জন সাহাবী শাহাদাহ বরণ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে কুরাইশ মুসলিমদের পরাজয় ঘটলেও। পরে মুসলিম তীরন্দাজদের মারাত্মক ভুলের কারণে তারা পুনরায় তাদের উপর আক্রমণ করে । এই যুদ্ধে রাসূল সা: মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর দাঁত মোবারক শহীদ হয় । তবে এই যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই জয় বা পরাজয় ঘটেনি। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৬০টি আয়াত নাজিল হয়েছে । এই যুদ্ধের পরপরই হামরাউল আসাদ অভিযান সংঘটিত হয় ।

✍ উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের মধ্যবর্তী অভিযান সমূহ...

উহুদ যুদ্ধের পরে যেসব গাযওয়া ও সারিয়্যা সংঘটিত হয় সেগুলো হলো:
আবু সালামার অভিযান, আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রা: এর অভিযান, রাজী সফর, বীরে মাউনার ঘটনা, বনু নাযীরের যুদ্ধ, যাতুর রিকা অভিযান, দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ, গাযওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল ।

✍ গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ...

পঞ্চম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয় । এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়, বলুন আজির গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দল মক্কার কুরাইশদের নিকট রাসূল সা: এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে এবং কুরাইশরাও তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে । পরে তারা সম্মিলিতভাবে এই যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মুসলিমগণ এই যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা খনন করেন । পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন সালমান ফারসি রা: । যুদ্ধে শত্রু দলের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০ হাজার এবং মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ হাজার। পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাবে এই যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে । এই যুদ্ধের পরে বনু কুরাইযা অভিযান, বনু লিহইয়ান অভিযান, যী কারাদ অভিযান ও বনু মুস্তালিক অভিযান ইত্যাদি সংঘটিত হয় ।

✍ **হুদাইবিয়ার সন্ধি...**

মদিনায় রাসুল সা: একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশ লাভ করেছেন। তিনি কা'বা গৃহের চাবি গ্রহণ করে সাহাবীগণসহ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ ও উমরাহ পালন করছেন। অতঃপর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ হিজরির যুলকাদাহ মাসে রসূল সা: সাহাবীদের নিয়ে উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা হলেন ।কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা তাঁদের সেবার উমরাহ সম্পন্ন করতে দিল না । মুসলমানরা কোনো ধরনের যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তবে কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় । মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও নবীজি সা: শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালান। তিনি প্রতিনিধি হিসেবে সাহাবী উসমান ইবনে আফফান রা:-কে পাঠান। উসমানের ফিরে আসতে দেরি হলে ভুল গুজব ছড়ায় যে কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে। এ অবস্থায় মহানবী সা: সাহাবীদের কাছ থেকে "বাইআতুর রিদওয়ান" গ্রহণ করেন, যা চূড়ান্ত সংকল্পের প্রকাশ ছিল। দীর্ঘ আলোচনা শেষে কুরাইশরা মুসলমানদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। এই চুক্তি হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। চুক্তির দফাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ:

১. রাসূলুল্লাহ সা: এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই সঙ্গী সাথিগণসহ মদীনায় ফিরে যাবেন। মুসলিমগণ আগামী বছর মক্কায় আগমন করবেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন। তাঁদের সঙ্গে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকবে এবং তরবারী কোষবদ্ধ থাকবে। তাঁদের আগমনে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।

২. দশ বছর পর্যন্ত দু' পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ সময় লোকজন নিরাপদ থাকবে, কেউ কারো উপর হাত উত্তোলন করবে না।

৩. যে সকল গোত্র কিংবা জনগোষ্ঠি মুহাম্মদ সা:-এর অঙ্গীকারাঙ্গনে প্রবেশ লাভ করতে চাইবে, প্রবেশ লাভ করতে পারবে। যে গোত্র যে দলে অংশ গ্রহণ করবে তাকে এ দলের অংশ গণ্য করা হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন গোত্রের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

৪. কুরাইশদের কোন লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পলায়ন করে মুহাম্মদ সা:-এর দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মুহাম্মদ-এর দলভুক্ত কোন লোক

আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে পলায়ন করে কুরাইশদের নিকট গেলে কুরাইশগণ তাকে ফেরত দেবে না।

ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দিক পরিবর্তনকারী সন্ধি হচ্ছে হুদাইবিয়ার সন্ধি । এই সন্ধি ছিল মুসলিমগনের জন্য এক বিরাট বিজয় স্বরূপ । যুহরী বলেন, পূর্বে ইসলামের যতগুলো বিজয় অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে এটিই (হুদাইবিয়ার সন্ধি) ছিল সবচেয়ে বড় বিজয় । এইসঙ্গে দফাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমগণের জন্য কিছুটা নতি স্বীকার করার কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে ছিল কুরাইশগণ কর্তৃক মুসলিমগণের শক্তির স্বীকারোক্তি । এর ফলস্বরূপ ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং সন্ধি পরবর্তী দুই বছরে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা সন্ধিপূর্ব ইসলাম গ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা চেয়ে বেশি হল।

✍ খাইবার বিজয়...

খাইবারের যুদ্ধ শুরু হয় সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে । মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিরা বারবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। বনু নাযীর এবং বনু কুরাইজা গোষ্ঠী মদিনা থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর তারা খাইবারে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। মদিনার মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমাগত হামলা এবং মক্কা ও খাইবারের শত্রুদের একত্রিত হওয়া তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খাইবার ছিল ইহুদি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির কেন্দ্র। এই অঞ্চলে প্রচুর খেজুর বাগান, উর্বর জমি এবং মজবুত দুর্গ ছিল। মুসলিমদের জন্য এটি দখল করা মানে ইহুদি ষড়যন্ত্রের একটি বড় কেন্দ্র ধ্বংস করা এবং মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। খাইবার ছিল দূর্গবেষ্টিত একটি অঞ্চল। মুসলিম সৈন্যরা একে একে খাইবারের গুরুত্বপূর্ণ আটটি দূর্গই বিজয় করেন। খাইবার বিজয়ের পর সাল্লাম ইবনে মুসকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস বকরির ভুনা গোশতে বিষ মিশিয়ে রাসূল সা: এর নিকট প্রেরণ করেন । তা থেকে রাসূল সা: গোশতের কিছু অংশ চিবানোর পর মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন। কিন্তু সাহাবী বিশর ইবনে বারা ইবনে মারূর রা: তা গিলে ফেলেন এবং এতে তিনি মারা গেলেন ।

খাইবার বিজয়ের পর রাসূল সা: এর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব যিনি পূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তিনি আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন ।

✍ উমরাতুল কাযা...

খাইবার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আগের বছরের অসম্পূর্ণ উমরাহর কাজা আদায় করার জন্য সপ্তম হিজরীর যুলকাদাহ মাসে রাসূল সা: তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় উমরাহ পালন করেন।

✍ মুতার যুদ্ধ...

এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ হারিস বিন 'উমায়ের আযদী রা:-কে একটি পত্রসহ বুসরার শাসকের নিকট প্রেরণ করেন এবং তদানীন্তন রোম সম্রাটের গভর্ণর শুরাহবিল বিন 'আমর গাস্সানী যিনি 'বালকা' নামক স্থানে নিযুক্ত ছিলেন তিনি হারিস রা:-কে বন্দী করার পর শক্ত করে বেঁধে হত্যা করেন। প্রকাশ থাকে যে, রাষ্ট্রীয় দূত এবং সংবাদ বাহকদের হত্যা করার ব্যাপারটি সব চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ এবং জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরণের কাজ ছিল যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, বরং বলা যায় যে, তার চেয়েও ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ যখন এ সংবাদ অবগত হলেন তখন তাঁর সামনে অনভিপ্রেত এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। মুসলিমগণের পক্ষে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। এ উদ্দেশ্যে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তিনি প্রস্তুত করে নিলেন ।**(৫)** এ যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন যায়দ ইবনে হারিসাকে রা: । শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক । যায়দ ইবনে হারিসা রা: শাহাদাহ বরণ করেন। তারপর সেনাপতি হন জাফর ইবনে আবু তালিব রা: । এরপর তিনিও শাহাদাহ বরণ করেন। তখন সেনাপতি হন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা: এবং তিনিও শহীদ হন । অবশেষে সেনাপতি নির্ধারণ করা হয় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা: কে । এ যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন।

✍ মক্কা বিজয়...

পটভূমি: মক্কার কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর বহু নির্যাতন চালায় এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। সন্ধির শর্ত ছিল যে ১০ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হবে না। কিন্তু কুরাইশরা তাদের মিত্র বানু বকর গোত্রকে দিয়ে মহানবীর সা:-এর মিত্র খুজা গোত্রের উপর আক্রমণ চালায়। এ কারণেই হুদায়বিয়ার সন্ধি লঙ্ঘিত হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় মহানবী সা: ১০,০০০ সাহাবীর একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা দেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয় করতে চেয়েছিলেন, যাতে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত না ঘটে।

মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশের সময় চারপাশ থেকে শহরকে ঘিরে ফেলে। কোনো বড় ধরনের যুদ্ধ না করেই মহানবী সা: মক্কা বিজয় করেন। কেবল সামান্য প্রতিরোধ দেখা গিয়েছিল। মহানবী সা: কাবা শরীফে প্রবেশ করে মূর্তি ও ভ্রান্ত উপাসনাকে ধ্বংস করেন এবং কাবাকে তাওহিদের ঘর হিসেবে ঘোষণা করেন।

মক্কা বিজয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মহানবী সা:-এর ক্ষমার মনোভাব। তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন:
"আজ তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশোধ নেই। তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করা হলো।"
এতে মক্কার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।
মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি ৮ম হিজরির রমাদান মাসে সংঘটিত হয়। এ ঘটনাটি ইসলাম ধর্মের বিস্তার ও কুরাইশদের প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা:-এর উদারতার অন্যতম স্মরণীয় উদাহরণ। মক্কা বিজয় শুধু একটি সামরিক বিজয় নয়, এটি ইসলামের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক।

✍ হুনাইনের যুদ্ধ...

মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এতে কিছু আরব গোত্র, বিশেষ করে হাওয়াজিন এবং সাকিফ গোত্র, তাদের অবস্থান হারানোর আশঙ্কায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। তারা একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে এবং মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য হুনাইনের উপত্যকায় অবস্থান নেয়। মহানবী সা: প্রায় ১২,০০০ জনের একটি বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হন। এ বাহিনীতে মদিনার মুজাহির ও আনসার ছাড়াও মক্কার নতুন মুসলমানরা অংশ নেয়। এটাই ছিল মুসলিমদের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী।

হাওয়াজিন এবং সাকিফ গোত্র হুনাইনের উপত্যকার পাহাড়ি গিরিপথে অবস্থান নেয় এবং মুসলিম বাহিনী আসার সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিত আক্রমণ করে। শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ ভয়ে পিছিয়ে যায়। তবে মহানবী সা: দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান নেন এবং সাহাবিদের আহ্বান জানান। মহানবী সা:-এর ডাকে সাহাবিরা পুনরায় সংগঠিত হয়। এরপর মুসলিম বাহিনী শত্রুদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালায়। আল্লাহর সাহায্যে শত্রু বাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় অষ্টম হিজরী সনে ।

✍ তাবুক যুদ্ধ...

এটি ৯ম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষ না হলেও এটি মুসলমানদের শক্তি প্রদর্শন এবং ইসলামের সামরিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। রোমান সাম্রাজ্য (বাইজেন্টাইন) মুসলিম শক্তির বৃদ্ধি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। খবর পাওয়া যায় যে তারা সিরিয়ার তাবুক এলাকায় মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছে।

তাবুক ছিল সিরিয়া ও আরব উপদ্বীপের মধ্যবর্তী একটি কৌশলগত অবস্থানে। এটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, কারণ এখান থেকে বাইজেন্টাইনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যেত। রাসূল সা: সংবাদ পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেন। তিনি মুসলমানদের তাবুকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন । তাবুক ছিল মদিনা থেকে বহু দূরের পথ । এটি ছিল এক প্রচণ্ড গরম সময় এবং রাস্তাটি ছিল দীর্ঘ ও কঠিন। প্রচণ্ড গরম এবং খাদ্য ও পানির অভাবে মুসলমানরা চরম কষ্টের মুখোমুখি হয়।

যেহেতু এটি ছিল একটি দীর্ঘ অভিযান, তাই অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই রাসূল সা: সাহাবিদের দান করতে উৎসাহিত করেন।

এই যুদ্ধে সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাদের সম্পদ থেকে দান করেন । হযরত আবু বকর রা: তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেন। হযরত উমর রা: তার সম্পদের অর্ধেক দান করেন। হযরত উসমান রা: বিপুল সম্পদ দান করেন, যার ফলে অনেক সৈন্যের অস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা হয়। মুসলিম বাহিনীতে প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য ছিল। এটি ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় মুসলিম বাহিনী। মুসলিম বাহিনী যখন তাবুকে পৌঁছায়, কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখে রোমান বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। তাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা পিছু হটে। রোমান বাহিনী যুদ্ধ না করেই পিছু হটে, এবং মুসলমানরা কোনো রক্তপাত ছাড়াই বিজয় অর্জন করে। তাবুক অভিযানের পর আশেপাশের অনেক আরব গোত্র ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং জিজিয়া কর প্রদান করতে রাজি হয়।

✍ বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আগমন...

মক্কা বিজয়ের পরপরই কুরাইশরা রাসূল সা: এর কাছে নত হল এবং ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করল । তখন আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো এবং চারদিক থেকে তাঁর কাছে লোকজন আসতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো । এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা নাসরে বলেছেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

“আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যখন এসে গেছে এবং তুমি দেখছো যে, লোক দলে দলে “আল্লাহর সাহাপ্রবেশ করছে, তখন প্রশংসা সহ তোমার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তার কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।”

✍ বাদশাহ ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ...

ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদাইবিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ সা: পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ ও শাসকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন । তিনি হাবশার সম্রাট নাজাশী, মিসরের সম্রাট মুকাওকিস, পারস্য সম্রাট কিসরা, রোমের সম্রাট কায়সার, মুনজির বিন সাভি, ইয়ামামা প্রধান হাউযাহ বিন আলী, দামেস্কের গভর্নর হারিস বিন আবি শামির গাসসানি এবং আম্মানের সম্রাট এর নামে পত্র প্রেরণ করেন ।

✍ বিদায় হজ্জ...

দশম হিজরীর যুলকাদাহ মাসে রাসূল সা: হজের জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং মুসলিমদের কেও প্রস্তুতি নিতে বললেন । অতঃপর যুলকাদাহ মাসের ৪/৫দিন অবশিষ্ট থাকতে হজ্জ উপলক্ষে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন । এরপর হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করলেন এবং আরাফার দিকে রওনা করলেন । এরপর বাতনে ওয়াদিতে গমন করে বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সা: এক ঐতিহাসিক ও মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করলেন । সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, হে জনতা! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো । কারণ আমি জানি না এরপর আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা । তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মর্যাদা একে অপরের জন্য হারাম করা হয়েছে, যেমন এই দিন, এই মাস এবং এই স্থান পবিত্র। আজ আমি জাহেলিয়াত যুগের সব সুদ রহিত করে দিলাম। এবং সর্বপ্রথম আমি আমার নিজের পরিবার, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করছি।

জাহিলী যুগে সংঘটিত সকল খুন জখমের শাস্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র ইবনে রাবীয়ার হত্যার শাস্তি বা প্রতিশোধ রহিত করছি। ইবনে রাবীয়া বনু লাইস গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল। বনু হুযাইল তাকে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ড দিয়েই আমি জাহিলী যুগের সকল হত্যাকাণ্ড ক্ষমা করার কাজ শুরু করছি। নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আসতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মৃদু প্রহার করতে পারবে। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে। হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ, আমার পরে আর নবী আসবে না। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজ আমি সম্পন্ন করেছি। আর তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। প্রকাশ্য সুস্পষ্ট জিনিস আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। হে জনগণ! আমার কথা শোনো ও হৃদয়ঙ্গম কর। জেনে রাখ, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। মুসলমানরা ভাই ভাই। কাজেই নিজের ভাইয়ের কোন জিনিস তার খুশী মনে দান করা ছাড়া নেয়া অবৈধ। তোমরা লোকদের ওপর যুলুম করো না। আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কি উত্তর দেবে? লোকেরা বললো, " নিশ্চয়ই আপনি আমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন যথাযথভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।" তিনি যখন তাঁর ভাষণ শেষ করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ (٣)

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।” (আল-মায়িদাহ: ৩)

✍ রাসূল সা:-এর পবিত্র জীবনের সমাপ্তি...

রাসূল সা: সর্বশেষ উসামা ইবনে যায়দ রা: কে ফিলিস্তিনে অভিযানে প্রেরণ করেন । এরই মধ্যে তাঁর মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করে । একদিন তিনি গভীর রাতে মদিনার কবরস্থান বাকীউল গারকাদে যান এবং কবরবাসীর জন্য ইস্তেগফার করেন । পরদিন থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । রাসূলুল্লাহ সা: তাঁর জীবনের শেষ দিকে হযরত মায়মুনা রা: এর ঘরে ছিলেন। এবং এই সময় তাঁর অসুস্থতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে হজরত আয়িশা রা: এর ঘরে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের দিন, ফজরের

সময় তিনি আবু বাকর রা: কে ইমামতির নির্দেশ দেন। সেদিন তিনি জ্বর ও শরীরের দুর্বলতায় ভুগছিলেন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি মিসওয়াক করলেন । এদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁর রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছিল এবং সে বিষের প্রতিক্রিয়া ও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল যা তাঁকে খাইবারে খাওয়ানো হয়েছিল । তিনি বললেন, "হে আয়িশা! খাইবারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি । মনে হচ্ছে এ বিষয়ে প্রভাবে আমার শিরা উপশিরাসমূহের জীবন কর্তিত হচ্ছে । মানুষের জন্য তার সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল,
আল্লাহর অভিসম্পাত ইয়াহুদ ও নাসারাদের প্রতি । আর তারা নবীগণের কবর সমূহ কে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে । তারা যা তৈরি করেছে তা থেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরোগ্য খন্ডে আর কখনো এ দুটি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না । অতঃপর রাসূল সা: সাহাবীগণকে উপদেশ প্রদান করে বললেন, সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাস-দাসী)! এই শব্দগুলো তিনি পুনরাবৃত্তি করেন । এরপর তাঁর দেহ আয়িশা রা: এর উপর ভর করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । দিনটি ছিল সোমবার।

তাঁর ইন্তিকালের পর মদিনায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সাহাবারা গভীর দুঃখে আবেগাপ্লুত হন। হজরত আবু বকর রা: সাহসিকতার সাথে সাহাবাদের সামনে এই ঘোষণা দেন:
"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে উপাসনা করত, সে জেনে রাখুক তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে উপাসনা করত, তিনি চিরঞ্জীব এবং মৃত্যুহীন।"

রাসূলুল্লাহ সা:-এর পবিত্র দেহ মসজিদে নববী সংলগ্ন আয়িশা রা: এর ঘরেই দাফন করা হয়। তার ইন্তিকালের মাধ্যমে নবুওয়াতের যুগের সমাপ্তি ঘটে।

✍ উম্মাহাতুল মু'মিনীন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এগারো জন স্ত্রী ছিলেন। যথা: হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা:, আয়িশা বিনতে আবু বাকর রা:, হাফসা বিনতে উমার ইবনুল খাত্তাব রা:, উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রা:, উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা রা:, সাওদা বিনতে যামআ ইবনে কায়েস রা:, যায়নাব বিনতে জাহাশ রা:, মাইমুনা বিনতে হারেস ইবনে হাযন রা:, জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস ইবনে আবু দিরার রা:, সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব ও যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা: । তন্মধ্যে দু'জন স্ত্রী তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন । তাঁরা হলেন হযরত খাদিজা রা: ও উম্মুল মাসাকীন যায়নাব

বিনতে খুযাইমা রা: । অধিকন্ত, আরো দু'জন নারীর সঙ্গে রাসূল সা: এর বিবাহ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে ।

✎ রাসূলুল্লাহ্ সা: এর মর্যাদা ও তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা...

রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর সর্বশেষ নবী এবং মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে "বিশ্বজগতের জন্য রহমত" হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যা আর কোনো মানুষ বা নবী পাননি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন, "আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ ।"(সূরা আম্বিয়া:১০৭)

মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে যেসব সদগুণাবলীর বিকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে সকল গুণাবলীর সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সা: এর অস্তিত্বের সবটুকু জুড়ে । তিনি ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক । তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত আমাদের জন্য চিরকাল অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় । তিনি ছিলেন সুদূরপ্রসারী চিন্তা চেতনার, সত্যের এবং ন্যায় পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল সুষমা মন্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা । তিনি ছিলেন বাকি সকলের থেকে অধিক দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন জুড়েই ছিল একের পর এক পরীক্ষা এবং তাতে তিনি যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা মানবজাতির জন্য এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ । আমানতদারিতা অতিথি পরায়ণতা সহমর্মিতা বিনয় ও নম্রতায় তিনি ছিলেন সবার থেকে এগিয়ে । তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা সকল বিষয় অনুধাবনের মাধ্যমে সদা সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতেন । যার ফলে জুলুম অন্যায় অনাচার ও অশ্লীলতা পরিবেষ্টিত সমাজে বসবাস করেও তিনি ছিলেন সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র । তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মানুষের মাঝে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছেন । তাঁর তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সকল গুনাহ থেকে পবিত্র । তথাপি তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি সব থেকে বেশি ও সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী । নবী করীম সা: ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যার সংশ্রবে আসা ব্যক্তিমাত্রই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানে হৃদয় পরিপূর্ণ না করে পারতেন না। বিরক্ত ও সাহসিকতায় তিনি ছিলেন সবার আগে। তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য শিক্ষা। তাঁর জীবনের প্রতিটি গুণাবলী আমাদের প্রত্যেকের জন্য আদর্শ । তাঁর অনুকরণ এবং অনুসরণ আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য লাভের পথকে সুগম করে।

☞ রেফারেন্স:

১.সহীহ মুসলিম শরীফ: দ্বিতীয় খন্ড: ২৪৫ পৃষ্ঠা, জামে তিরমিযি দ্বিতীয় খন্ড: ২০১ পৃষ্ঠা.
২.আহমাদ, ছহীহ ইবনু হিববান, আবু উমামাহ হ'তে; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৪৫।
৩.সহীহুল বুখারী খাদীজাহর সঙ্গে নবী সে-এর বিবাহ ও তাঁর ফযীলত অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৩৯ পৃ।
৪. সহীহুল বুখারী বাবু বা'দা হালাওয়াতিল ঈমান ১/৭ পৃ.। বাবু অফদিল আনসার ১/৫৫০-৫৫১ শব্দ এ বাবেরই, বাবু কাওলেহী তা'আলা, ২য় খন্ড ৭২৭ পৃঃ। বাবুল হদুদে কাফফারাতুন ২/১০০৩ পৃ
৫. যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৫৫ পৃ., ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫১১ পৃ.।
৬.বই: সিরাত ইবনে হিশাম, আর-রাহিকুল মাখতূম বা মোহরাঙ্কিত জান্নাতি সুধা।

☞ বইয়ের রেফারেন্স:

১.কাসাসুল আম্বিয়া, ২.নবিদের কাহিনী, ৩.সিরাত ইবনে হিশাম, ৪.আর-রাহিকুল মাখতূম বা মোহরাঙ্কিত জান্নাতি সুধা।